দিল্লীকা লাড্ডু

তারাশঙ্কর
বন্দ্যোপাধ্যায়

পি, কে, বসু এ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা ৩১

B2310

SCL Kolkata

এই লেখকের—

মন্বন্তর
বেদেনী
প্রতিধ্বনি
স্থলপদ্ম
পাষাণপুরী
ছলনাময়ী
জলসা ঘর
রাইকমল
চৈতালী ঘূর্ণি
নীলকণ্ঠ
যাদুকরী
প্রেম ও প্রয়োজন
হারানো সুর
কবি
গণদেবতা
ধাত্রীদেবতা
আগুন
কালিন্দী
রসকলি

দ্বীপান্তর
কালিন্দী
দুই পুরুষ
পথের ডাক

STATE CENTRAL LIBRARY
BENGAL
CALCUTTA

দিল্লীকা লাড্ডু

নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ যে করে, সে মন্দ লোক হইতে পারে ; কিন্তু সে যে সাহসী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কারণ নাক-কাটা ব্যাপারটি তো সহজ নয়; এমন কি ব্লেডের এক প্যাঁচে কাটিবে—ইহা নিশ্চিত জানিয়াও কাটিবার পূর্ব্বে সাত পাঁচ ভাবনা হয়। সেই ভাবনাই তো ভয় এবং সেই ভয়েই সংসারে শতকরা নিরানব্বই জন একজনের কাটা নাক দেখিয়া যাত্রাভঙ্গ করিয়া বসিয়া থাকে।

আমাদের গ্রামের হীরেন মুখুজ্জের মত নিরীহ প্রকৃতির ব্যক্তিটি যে অকস্মাৎ খোলস ছাড়িয়া সেই একজন হইয়া দাঁড়াইতে পারে—এ ধারণাই কেহ কোনদিন করিতে পারে নাই। এ যেন বল্মীকস্তূপের অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরিরূপে আত্মপ্রকাশ।

চল্লিশ বৎসর বয়সে সাত সাতটি পুত্র কন্যা সত্ত্বেও হীরেন দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া বসিল। বড় পুত্রটির বয়স উনিশ ; দ্বিতীয়া কন্যাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; বাকি পাঁচটি পনেরো হইতে তিন পর্য্যন্ত, হারমোনিয়মের রিডের মত সারবন্দী দাওয়ায় বসিয়া ক্রন্দন ও কোলাহলের অবিরাম বেসুরো কোরাস জমাইয়া রাখিয়াছে। হীরেনের বিবাহ হইয়াছিল তেরো বৎসর বয়সে, উপনয়নের পর ন্যাড়া মাথায় টোপর পরিয়া নয় বৎসরের বধূকে সে ঘরে আনিয়াছিল। তাহারও আগে বধূ ছিল একেবারে ঘরের পাশেই। দুই বাড়ির মধ্যে কেবল একটা গলির ব্যবধান। দীর্ঘ সাতাশ বৎসর বিবাহিত জীবনে হীরেন কখনও রাত্রি নয়টার বেশি নয়টা এক

মিনিট পর্য্যন্ত বাহিরে থাকে নাই ; তাও ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম নয়, ক্যালকাটা টাইম। শুধু তাই নয়, এই সাতাশ বৎসর ধরিয়া একবেলা ভাত রাঁধিয়াছে, সকালে বিছানা তুলিয়াছে, ছেলেদের স্নান করাইয়াছে, স্ত্রী সূতিকাগারে প্রবেশ করিলে ছোটগুলির বিছানা কাচিয়াছে, রৌদ্রে দিয়াছে। সুতরাং ছেলেগুলিকে মানুষ করিবার অজুহাতে যে একটি তরুণীর প্রয়োজন, এটা নিতান্তই বাজে কথা। পুরুষ মহলে হীরেনের এই অকল্পিত সাহসিকতায় তাক লাগিয়া গেল। তাহার উপর বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে না কাটিতে তাহারা অনুভব করিল, জীবন পথে তাহাদের যাত্রাভঙ্গ ঘটিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়াও চলা দুষ্কর।

শ্যামের স্ত্রী রাত্রে স্বামীর হাতখানা সরাইয়া দিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, যাও, যাও, পুরুষ জাতের মুখে আগুন। তোমাদের ছুঁলে পাপ, গঙ্গাস্নান করতে হয়।

শ্যাম এ আকস্মিকতায় ঘাবড়াইয়া গেল। একেই স্ত্রীকে সে বাঘিনীর মত ভয় করে ; তাহার উপর অকস্মাৎ তাহাকে উল্কামুখী হইতে দেখিয়া বুকটা তাহার ঢিপঢিপ করিয়া উঠিল। শৃগালী উল্কামুখী কোনও রকমে সহ্য হইয়াছে, কিন্তু বাঘিনীর ক্ষুরধার দাঁতে যদি দাহিকা শক্তি যুক্ত হয় তবে—ভাবিয়াও শ্যাম শিহরিয়া উঠিল। একেই কাঁচা মাংসের স্বাদে বাঘিনী ভয়ঙ্করী, তাহার উপর দাহিকা শক্তির প্রসাদে সিদ্ধ মাংসে কালিয়ার আস্বাদ পাইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

আজ আবার সে বাঘিনীকে খোঁচা দিয়াছে। সে আজই লোহার কাঁটা দিয়া স্ত্রীর বাক্স খুলিয়া চারিটি সিকি সরাইয়া ফেলিয়াছে। না ফেলিয়াও বেচারার উপায় ছিল না, বিড়িওয়ালা বেনে মামার কাছে দেড় টাকার উপর ধার জমিয়া উঠিয়াছে ; সে আর ধার দিবে না বলিয়া নোটিস দিয়াছিল। শ্যামের বরাদ্দ দৈনিক এক পয়সার বিড়ি, কিন্তু তাহাতে

তাহার কুলায় না। এক পয়সায় দশটা বিড়ির মধ্যে পাঁচটা যায় দোক্তা হিসাবে, বাকি পাঁচটায় কাহারও দিন চলা অসম্ভব।

স্পন্দিত বক্ষে শুষ্ক মুখে শ্যাম তাহার পেটেণ্ট 'হে হে' শব্দে বোকা হাসি হাসিয়া বলিল, কেন, কি হ'ল কি?

সুগ্রীব-মহিষীর মত মুখভঙ্গি করিয়া স্ত্রী বলিল, হেসো না, আর হেসো না, বুঝলে? "বাঁদরের মুখ পোড়ে আর বাঁদর হাসে,—বলে, এ কি সৌভাগ্য হ'ল আমার", সেই বিত্তান্ত!

শ্যাম উষ্ণ হইয়া উঠিল, বাঁদর হইবার কামনাই তাহার জাগিয়া উঠিল, লেজ গজাইলে সে স্ত্রীর গলায় জড়াইয়া কণ্ঠরোধ তো করিতই, উপরন্তু বালি-রাবণ-সংবাদের মত একটা নূতন সংবাদের সৃষ্টি করিত, স্ত্রীকে সাত ঘাটে চুবাইয়া লোনা জলের সাহায্যে ভিতরের সমস্ত বাঁদরামী উদগীরণ করাইয়া ছাড়িত। লেজের অভাবে সে দাঁত খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে তুমি বাঁদর বলছ?

তাহার মুখের কাছে দুই হাত নাড়িয়া দিয়া স্ত্রী বলিল, বলছি, বলছি, বলছি! শুধু তোমাকে নয়, গোটা পুরুষ জাতকে বলছি। সাত সাতটা বেটা বেটী থাকতে চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করতে তোমাদের লজ্জা করে না? তোমরা সবাই হীরেন মুখুজ্জে।

সাপের মাথায় ইসের মূল পড়িল; শ্যাম একেবারে ফণা গুটাইয়া ঝাঁপির মধ্যে কুণ্ডলী পাকানো সাপের মত ন্যাতাইয়া পড়িল। আবার সে তাহার পেটেণ্ট 'হে হে' করিয়া বোকার হাসি হাসিয়া বলিল, তা তুমি বলেছ ঠিক। হে—হে—হে; কিন্তু সবাই তো আর হীরেন—

সবাই, সবাই, গোটা পুরুষ জাতটাই হীরেন।

শ্যাম মহা বিরক্ত হইয়া হীরেনকে গাল দিয়া উঠিল, শা—লা!

রামের বাড়িতেও সেই অবস্থা।

রাম লেখাপড়া জানা লোক; শুধু লেখাপড়া জানাই নয়, সে একেবারে আধুনিক, যাহাকে বলে মডার্ন। তাহার স্ত্রীও শিক্ষিতা মেয়ে, ফেরতা দিয়া কাপড় পরে, হাই হিল জুতা পরে, চোখে চশমা দেয়; বব ছাটেনা কেবল চুলের বাহারের জন্য; চুলগুলি তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ এবং উপলসঙ্কুল ঝরনার মত ঢেউ খেলানো।

রূপার তৈয়ারি দেশী দাঁত খুঁটনির আকারের মত ভঙ্গিতে ঠোঁটের একদিক বাঁকাইয়া রামের স্ত্রী বলিল, রাম সীতার শোকে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন, ওটা বাজে কথা। বাল্মীকি আর শিশির ভাদুড়ীর সাজানো কথা। আসলে তিনি আর একটা বিয়ে করতে না পেয়ে পাগল হয়েছিলেন।

রাম একখানা বই পড়িতেছিল—ফ্রয়েডের মনস্তত্ব, সে মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, বাল্মীকিকে তুমি দেখই নি, শিশির ভাদুড়ীর রামরূপও কিন্তু তোমার মনের মধ্যে এখন নেই, এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। মনে মনে তুমি দেখছ হীরেন মুখুজ্জেকে, আই অ্যাম সিওর।

বুদ্ধি এবং শিক্ষার জোরেই তোমরা এতদিন তোমাদের বর্ব্বর রূপ ঢাকা দিয়ে নিজেদের ঢাক বাজিয়ে এসেছ—এ কথাটা হাজার বার স্বীকার করি। হীরেনের মধ্যে যে পুরুষ প্রকৃতি, সেটা অবশ্যই রামের মধ্যেও ছিল এবং তোমার মধ্যেও আছে, এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

স্বীকার করলাম। কিন্তু হীরেন বিয়ে করায় তোমার ক্রোধের হেতু ফ্রয়েড অনুসারে—

কি? হাজার বাতির সমকক্ষ ইলেকট্রিক বাল্বের সুইচ কে যেন 'অন্' করিয়া দিল, শিক্ষিতা স্ত্রী ভদ্রভাবে তীক্ষ্ণতম স্বরে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, ব্রুট কোথাকার!

পরমুহূর্ত্তেই যেন ফিউজ হইয়া গেল, ঘরখানাকে অন্ধকার করিয়া দিয়া সে অন্তর্হিতা হইল। আধুনিকা হইয়াও সনাতন গোসা ঘরে খিল দিল। রাম কিছুক্ষণ চেষ্টা করিল আবার বইয়ে মন দিতে। কিন্তু হাজারো রকমে মনকে বিশ্লেষণ করিয়াও মনকে একাগ্র অথবা শান্ত করিতে পারিল না। বইখানাকে রাখিয়া দিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে সে ভয়ানক চটিয়া উঠিল হীরেনের উপর, দূর হইতেই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া গালি দিয়া উঠিল, বাঁষ্ট!

গ্রামের এই নর-নারী-সংবাদ হীরেনের কানেও উঠিয়াছিল। সে কিন্তু মোটেই লজ্জিত হইল না বা দমিল না। বল্মীকস্তূপ অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরি হইয়া উঠিয়া কেবল অগ্ন্যুদ্গারই করিতে আরম্ভ করিল; প্রকাশ্য পথেই সে আস্ফালন আরম্ভ করিল, কুছ পরোয়া নেই, এ তো বউ ম'লে বিয়ে করেছি, এবার একটা থাকতেই আবার বিয়ে করব। এক আধটা নয়—পাঁচ দশটা, দেখি কে কি করে আমার! চালাও পানসী!

হীরেনের সাহস দেখিয়া সমস্ত পুরুষ-সমাজ সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু গোপনে! প্রকাশ্যে তাহারা তাহাকে গালিগালাজ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া দিল।

* * *

হীরেনের আস্ফালনের সংবাদ পাইয়া মেয়েরা যেন রণরঙ্গিণী হইয়া পুরুষদের জীবন্ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। দায়ে পড়িয়া পুরুষেরা ভগবৎ-ভক্ত হইয়া উঠিল। সাধুগণকে ত্রাণ কর, হে ভগবান! কেহ কেহ গোপনে গিরিমাটির সন্ধান করিতে লাগিল। শ্যাম বেচারা তো মুমূর্ষুর মত হতবাক হতচেতন হইয়া শবের মত এলাইয়া পড়িল; কিন্তু কাল কলি বলিয়া শাস্ত্রও মিথ্যা হইয়া গেল, শ্যামের স্ত্রী হতচেতন স্বামীর বুকের উপর প্রায় নাচিতে লাগিল, তবু জিভ কাটিল না।

ঠিক এমন সময়ে—যে ভগবান যুগে যুগে সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হন—তিনি বোধ হয় দুঃস্থ পুরুষগণের দুঃখ মোচনের জন্য অবতীর্ণ না হইয়াও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। চাকা ঘুরিয়া গেল। গাঙ্গুলীদের ছেলে নীরেন ভগবানের ইঙ্গিতে একটা বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল। নীরেন এম. এ পাস, ভাল চাকরি করে; মাত্র বৎসর দুয়েক পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর শরীর খারাপ দেখিয়া সে তাহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া গেল; এবং কয়েকদিন পরেই বাড়ীতে সংবাদ দিল, বধূটির যক্ষ্মা হইয়াছে। তাহার চিকিৎসার জন্য তাহাকে এখন হাসপাতালে রাখিয়াছে। তাহার সেবাশুশ্রূষার জন্য নিজেও সে ছুটি লইয়াছে। নীরেনের বাপ-মা ছুটিয়া কলিকাতায় গেলেন, কিন্তু কয়েকদিন পরই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া কেহ কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। নীরেনের মা ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিতেছেন, নীরেনের বাপের মুখ উদাস গম্ভীর। সংবাদটা অনুমান করিয়া লইবার পথে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা কোথাও ছিল না, ষ্টেশনে সমবেত সকলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

রামও ষ্টেশনে ছিল, সে বাড়ীতে গিয়া সুগভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ, নীরেনের বউটি মারা গিয়েছে!

রামের স্ত্রী চমকিয়া উঠিল, কে? কে মারা গিয়েছে?

নীরেনের স্ত্রী। ভেরী স্যাড।

রামের স্ত্রী স্তব্ধ হইয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। রাম সে দৃষ্টি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল, যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্বেই সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের উদ্যোগ করিল।

রামের স্ত্রী বলিল, চললে কোথা? তোমার তো আর স্ত্রী মরে নি যে, ঘোড়ার খোঁজে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরুচ্ছ!

রাম অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াও সভয়ে বলিল, কি বল তুমি তার ঠিক নেই!

হাসিয়া রামের স্ত্রী বলিল, বলি আমি ঠিক।

রাম আবার ফিরিয়া বসিয়া বলিল, নাও, কি বলছ বল?

একটি কাজ করতে হবে। নীরেনের সঙ্গে শেফালির বিয়ের সম্বন্ধ করতে হবে। বাবা আমার টাকা খরচ করতে পেছুবেন না।

রামের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, নীরেন হীরেনের সম্বন্ধে কি রকম ভাইও হয়, না? বোধ হয় মাসতুতো!

রামের স্ত্রী বলিল, সে আমি জানি না, তবে তোমার ভাবী ভায়রাভাই এটা আমি জানি।

সন্ধ্যার পর রাম বেড়াইয়া ফিরিলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, গিয়েছিলে নীরেনদের বাড়ি?

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাঁকা হাসি হাসিয়া রাম বলিল, গিয়েছিলাম।

সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে স্ত্রী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

রাম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাঁকা-হাসি একটু বেশি করিয়া হাসিয়া বলিল, শুনলাম, হীরেনের সঙ্গে নীরেনের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রামসম্পর্ক পর্য্যন্ত না।

কপাল কুঁচকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্ত্রী বলিল, মানে?

মানে, নীরেনের স্ত্রীর মৃত্যু এখনও হয় নি এবং নীরেন তার রুগ্না স্ত্রীর শিয়রে সাবিত্রীর মত ব'সে আছে। বাপ মা:কারও অনুরোধ শোনে নি। চাকরি থেকে ছ'মাসের ছুটি নিয়েছে, এবং দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দেবে।

স্ত্রী কিছুক্ষণ রামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমাদের

জাতটাই এমনই, বুঝেছ? স্ত্রীর জন্যে মা বাপকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দাও তোমরা!

বুদ্ধিমান, বহু বিদ্যার অধিকারী রাম হতবাক হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যামের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রথমে সে সগৌরবে একটা বিড়ি ফেলিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, শুনেছ তো?

স্ত্রী মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, যখের ধন-টন পেয়েছ নাকি?

খুব করিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শ্যাম বসিল, বলি হীরেনের কথা নিয়ে খুব তো কথা বল—

বাধা দিয়া স্ত্রী বলিল, দু টান খেয়েই বিড়িটা ফেলে আবার একটা বিড়ি ধরালে যে?

ফেলিয়া দেওয়া আধপোড়া বিড়িটা কুড়াইয়া কুলুঙ্গিতে রাখিয়া দিয়া শ্যাম বলিল, ধেৎতেরি, বিড়ির নিকুচি করেছে!

স্ত্রী বলিল, তা বইকি, মরদের মুরদ তো বিশ বিঘে ধানের জমি। তাতে বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টি পয়সার বিড়ি চাই। সেই বিড়ি ফেলে দেওয়া!

শ্যাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, অপরাধ হয়েছে, বাপ রে, বাপ রে!

স্ত্রী এ কথার কোন প্রতিবাদ করিল না, গম্ভীরভাবে পানের বাটা টানিয়া লইয়া দোক্তা খাইবার উপযোগী ডবল খিলি রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্যাম বলিল, নীরেনের কথা শুনেছ তো? হীরেনের কথা নিয়ে খুব তো খোঁচা দিয়ে দিয়ে কথা বল। নীরেন কি রকম—

যাও যাও, স্ত্রৈণ ভেড়ুয়া কোথাকার! ওই কথা নিয়ে বড়াই করতে লজ্জা করে না? বুড়ো বাপ মা, তুই একমাত্র ছেলে, তাদের ছেড়ে তুই—হুঁ! গলায় দড়ি তোমাদের। আমার ছেলে হ'লে কান ধরে টেনে আনতাম, এনে বিয়ে দিতাম! ছেলে নেই, পুলে নেই, কাঁচা বয়েস—হুঁ।

শ্যাম বিছানার উপর শুইয়া পড়িল, স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইয়া নিঃশেষিত-প্রায় বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া ঘরের চালকাঠের দিকে চাহিয়া গান ধরিল, 'তনয়ে তারো তারি—ণী'!

স্ত্রী বলিল, একটা টৌকির গান গাও। যত সব সেকেলে গান!

শ্যামের কণ্ঠস্বরটি ভাল, গানও সে ভালই গায়। স্ত্রীর কথায় তাহার তারিণীর স্তব অসমাপ্ত রহিয়া গেল, কিন্তু টকির গান তাহার একটাও মনে পড়িল না।

শুধু রাম আর শ্যাম নয়, যদু, মধু, হরি, মাধব, যাদব, সকলের বাড়িতেই এখন নীরেনের আলোচনা; হীরেন এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে। নিষ্কৃতি'পাইয়া সে বেশ স্বাভাবিক হইয়া উঠিল; হাট করে, বাজার করে, জমি দেখে, তাস খেলে, নীরেনকে লইয়া সেও আলোচনা করে। আলোচনায় সকলের সহিত সেও একমত। এটা একেবারে বাড়াবাড়ি, বাড়াবাড়িরও বেশি—অপরাধ।

মেয়েরা বলে, আদিখ্যেতা!

নীরেনের বাপ ছেলেকে বুঝাইয়া পত্র দিলেন, লিখিলেন, সমগ্র গ্রামের লোক তোমার এ আচরণের নিন্দা করিতেছে। তাহা ছাড়া তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, বিজ্ঞান বল, শাস্ত্র বল, কিসে তুমি তোমার

এই আচরণের সমর্থন পাইলে? এ মায়া মিথ্যা, মিথ্যার মোহে পড়িয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিও না।

নীরেন উত্তর দিল, গ্রামের লোকের স্তুতি-নিন্দায় আমার কিছু আসে যায় না। বিজ্ঞান ও শাস্ত্র এ দুইকেও আমি মানি না। তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু প্রেম, একমাত্র তাহাকেই আমি মানি।

শাস্ত্রকে মানি না বলিয়া রেহাই আছে, কিন্তু বিজ্ঞানকে মানি না বলা ধৃষ্টতা; মাস কয়েক পরেই নীরেনের স্ত্রী মারা গেল। নীরেনের বাপ মা আবার একবার কলিকাতায় ছুটিলেন, কিন্তু দুজনেই সেই পূর্ব্বের মত ফিরিয়া আসিলেন, বাপের মুখ গম্ভীর, মায়ের চোখে জল। নীরেন আসে নাই, সে কাশী গিয়াছে, সেইখানেই স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি সারিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইবে।

ঘরে ঘরে আবার একবার আলোচনা জমিয়া উঠিল।

শ্যামের স্ত্রী বলিল, মুখে ঝ্যাঁটা মুখে ঝ্যাঁটা! বুড়ো বাপ-মাকে ফেলে স্ত্রীর শোকে সন্ন্যেসী হওয়ার মুখে ঝ্যাঁটা।

শ্যামের উপস্থিত বিড়ির পয়সার প্রয়োজন ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে সমর্থন করিয়া বলিল, একশো বার।

শ্যামের স্ত্রী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, একশো বার? হাজার বার, লক্ষ বার।

শ্যাম বলিল, আমিও তো তাই বলছি। তুমি রাগছ কেন?

রাগছি কেন? তোমাদের দেখলে সর্ব্বাঙ্গ জলে যায়। তোমরা কি মানুষ? তোমরা জানোয়ার।

সকালবেলা হইতে বিড়ি খাইতে না পাইয়া শ্যামের মেজাজ ভিতরে ভিতরে রুক্ষ হইয়াছিল, তাহার উপর গালিগালাজের ক্রম-

……"তোমরা কি মানুষ? তোমরা জানোয়ার……"

বর্দ্ধমান প্রচণ্ডতায় বিড়ির পয়সার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া সে বলিল, কি, আমরা জানোয়ার ?

একশো বার, হাজার বার, লক্ষ বার।

লক্ষ বার।

হ্যাঁ, কোটিবার।

তবে এই দেখ।—বলিয়া শ্যাম উঠান হইতে একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া উনানের উপর ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটার গায়ে দুম করিয়া বসাইয়া দিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্যামের স্ত্রী প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল, কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোষণা করিল, ওগো মা গো, শেষে তুমি মাতাল গেঁজেলের হাতে আমাকে দিয়ে গেলে গো!

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সে বসিয়া আপনার বাপকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল, আবাগীর বেটা, চোখখেকো, কঞ্জুস, কিপটে, পয়সা খরচের ভয়ে আমার এই দশা ক'রে গেলি তুই।

এখানে বলা প্রয়োজন শ্যামেরা বংশজ; তাহারা বরপণ পায় না, কন্যাপণ দিয়া তাহাদের বিবাহ করিতে হয়।

শ্যাম বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছিল, হীরেনদের পাড়ায় আসিয়া দেখিল, রাস্তার উপরেই বেশ একটা মজলিস জমিয়া উঠিয়াছে; মায় বুদ্ধিমান পণ্ডিত রাম পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত। সেও আসিয়া জমাইয়া বসিল! সঙ্গে সঙ্গে একজন তাহার দিকে বিড়ি দেশলাই আগাইয়া দিল, বলিল, ব'স ব'স। একটা বেশ নধর খাসী দেখে দাও দেখি ভাই শ্যাম।

শ্যাম স্বভাবগত নির্ব্বুদ্ধিতার সহিত অকারণে প্রশ্ন করিল, খাসী?

হ্যাঁ, খাসী। হীরেনের নতুন বউয়ের আজ সাধভক্ষণ। আমরা রাত্রে ফিষ্টি খাব।

অন্য একজন বলিল, একটা খাসীতে হবে তো? মেয়েরাও তো ছাড়বে না।

রাম প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, তা হলে আমি নেই কিন্তু। ওদের সঙ্গে সামাজিক ভোজন না ক'রে উপায় নেই, কিন্তু প্রীতিভোজন অসম্ভব।

শ্যাম কথাটা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সায় দিল—আলবাৎ!

* * * *

মাস দুয়েক পর।

একদিন গভীর রাত্রে রাম তখনও একখানা বই পড়িতেছিল, তাহার আধুনিকা-স্ত্রী সন্ধ্যা হইতে তাহার সহিত তর্কের নামে তুমুল কলহ করিয়া সদ্য ঘুমাইয়াছে। তর্কের বিষয় ছিল হীরেনের তথা সমগ্র পুরুষ জাতির নির্লজ্জতা। জীবজগতে অতিবড় নির্লজ্জ না হইলে এমন করিয়া কেহ বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্য্যার সাধভক্ষণ উপলক্ষে প্রকাশ্যভাবে সমারোহ করিতে পারে না। পরিশেষে বলিয়াছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হীরেনের বউ লজ্জায় কারও সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারে নি।

রাম উত্তরে তুলিয়াছিল নীরেনের প্রসঙ্গ, ফলে স্ত্রীর চোখে মুখে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; সভয়ে রাম সকল প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া বই লইয়া বসিয়াছে। সহসা একটা বুকফাটা ক্রন্দন-ধ্বনিতে নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া গেল! সে চমকিয়া উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আর কিছু শোনা গেল না।

ঘণ্টাখানেক পর শ্যাম ডাকিল, রাম! রাম!

কি হে? চকিত হইয়া রাম জানালা খুলিয়া সাড়া দিল।

আসতে হবে ভাই একবার। হীরেনের বউটি মারা গেল।

মারা গেল ?

হ্যাঁ। প্রসব হ'তে গিয়ে মারা গেল।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া শ্যাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হীরেন বেচারীর ভাগ্যটাই খারাপ।

স্ত্রী বলিল, খারাপ ? পরম ভাগ্যবান্ লোক। লাফ দিয়ে আবার ঘোড়ায় চড়বে।

শ্যাম চুপ করিয়া রহিল, হীরেনের সপক্ষে কিছু বলিবার সাহস তাহার হইল না, আর বলিবার আছেই বা কি ?

স্ত্রী বলিল, একটি উপকার কর দেখি আমার। আমার মাসীর অবস্থা খুব খারাপ, তার ওপর আঠারো বছরের মেয়ে গলায় ; হীরেনকে ব'লে-কয়ে বিয়েটি ঘটিয়ে দাও দেখি।

শ্যামের লজ্জা হইল, কিন্তু সে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। তাগাদার পর তাগাদা সে শ্রাদ্ধশান্তির অজুহাতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অবশেষে একদিন প্রভাতে উঠিয়াই হীরেনের নিকট না গিয়া পারিল না।

হীরেনের দরজায় বেশ একটি ভিড় জমিয়াছিল, অনেকগুলি লোক। মধ্যস্থলে হীরেনের প্রথম পক্ষের শ্বশুর দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া বলিতেছেন, বৃদ্ধ বয়সে আমার শাস্তিটা দেখ ! ওই নাতি-নাতনীর দল. তার বিষয়পত্র—এ সব কি আমার চালাবার শক্তি আছে, না সময় আছে ?

হীরেন গত রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শ্বশুরকে পত্র দিয়া গিয়াছে, "সংসারে আমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে ; ছেলেপুলেগুলির ভার, বিষয়পত্রের ভার আপনার উপরই রহিল।"

শ্যাম হাঁফ ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিল।

স্ত্রী বলিল, বৈরাগ্য ?

শ্যাম বলিল, হ্যাঁ।

মুখে আগুন বৈরাগ্যের, একঘর ছেলেপুলে, তাদের ভাসিয়ে দিয়ে বৈরাগ্য! তারপর স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল, তোমরা এমনই বটে।

রামের স্ত্রী বলিল, বৈরাগ্য, ভালবাসা, ও আমি বিশ্বাসই করি না। হীরেন আর বিয়ে করতে পাবে না ব'লে দেশত্যাগ করেছে।

রাম অবাক হইয়া গেল।

স্ত্রী বলিল, তা বিধবা বিবাহ করলেই পারত। আজকাল তো আকছার হচ্ছে। একটা আদর্শ স্থাপন করাও হ'ত। তারপর হাসিয়া বলিল, আমার মৃত্যুর পর তুমি অবশ্যই বিয়ে করবে; তুমি কিন্তু বিধবা বিবাহ ক'র।

রামের ইচ্ছা হইল, ঠাস করিয়া স্ত্রীর গালে পুরাকালের মত একটি চড় কষাইয়া দেয়।

*

গ্রামে আলোচনাটা তুমুল হইয়া উঠিল।

সে তুমুল আলোচনাকে ঢাকিয়া দিয়া অকস্মাৎ কোথায় নহবতের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

বাঁশী বাজিতেছিল নীরেনদের দরজায়। নীরেন বিবাহ করিয়াছে। আজই সে বউ লইয়া ফিরিবে ১২টার ট্রেনে, এইমাত্র টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

রামের বউ ফিক ফিক করিয়া বাঁকা-হাসি হাসিতে আরম্ভ করিল; শ্যামের বউ উঠানময় আরম্ভ করিল রণরঙ্গিণী নৃত্য।

শ্যামের অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবিতেছিল, চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোক—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। এ ছাড়া আর উপায় নাই। স্ত্রীর মাসীর ওই আঠারো বছরের কন্যাটিকেই—!

পঞ্চরুদ্রের মৃত্যু। অপঘাতে অপমৃত্যু হইয়া গিয়াছে; আজ তাহারই প্রেতক্রিয়া উপলক্ষে সমারোহের কাণ্ড, লাঠালাঠি ব্যাপার; রক্তগঙ্গা হইবার সম্ভাবনা।

এক নয়, দুই নয়, পঞ্চ রুদ্র, পঞ্চমুখ পঞ্চাননের পঞ্চ মূর্ত্তির মৃত্যু—তাও অপমৃত্যু! রক্তগঙ্গা হইবে না? সমস্ত গ্রামটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বের কথাটা আগে বলা প্রয়োজন।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে অন্নভিখারী পঞ্চানন মহুগ্রামের রামরতন পাঁজার বাড়িতে পাঁচটি বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধ হয় পাঁচ মুখে খাইয়া এক উদরে খাদ্যসম্ভার সঙ্কুলান করিতে কষ্ট হইতেছিল, তাই তিনি পাঁচ মুখের জন্য পাঁচটি স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

রামরতন পাঁজার তখন জমজমাট সংসার, ধনে পুত্রে পাঁজাবাড়ি হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। উর্ব্বর ক্ষেত্র. খামার ভরা মরাই, পুকুর-ভরা মাছ, গোয়াল-ভরা পয়স্বিনী গাভী, লোহার সিন্দুকে সোনারূপা,—মোট কথা পরিপূর্ণ সংসার! ঠিক এই সময়েই ভিখারী শিবঠাকুর অন্নলোভে আসিয়া বলিলেন, ওহে পাঁজা আমাদের চারটি ক'রে খেতে দিতে হবে তোমাকে!

অর্থাৎ, একদা রাত্রে পাঁজা স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই তিনি বড়ছেলেকে ডাকিয়া আদ্যন্ত স্বপ্নের বিবরণ বিবৃত করিয়া বলিলেন, শিবপ্রতিষ্ঠার উদ্যুগ কর।

সংবাদটা শুনিয়া গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু আলাদা ক'রে করব। তোমার শিব থাকবেন ডান দিকে, আমার শিব থাকবেন বাঁয়ে।—বলিয়া তিনি ফিক করিয়া হাসিলেন।

'বেলা যে যায়' কথাটা শুনিয়া সাধু-মহাত্মার বৈরাগ্য উদয় হয়, অথচ কথাটা অত্যন্ত সাধারণ, বেলা রোজই যায় এবং প্রত্যহই বহু লোক বহুবারই বলিয়া থাকে। পাঁজা-গৃহিণীও দিনে এমন হাসি বহুবারই হাসেন, কিন্তু এই মুহূর্ত্তের হাসিটি পাঁজা মহাশয়ের বুকে সম্মোহন-বাণের মত গিয়া বিঁধিল, তাঁহার অঙ্গ যেন অবশ হইয়া গেল। তিনিও ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বেড়ে বলেছ!

কিছুক্ষণ পর দুই বিধবা ভগ্নী আসিয়া বলিল, আমাদের সাধ দাদা, বহুদিনের।

পাঁজা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, হুঁ।

এক ভগ্নী বলিল, আমাদের বাপ বল, মা বল, ভাই বল, পুত্তুর বল —সবই তুমি। তুমি যদি আমাদের মুখের দিকে না তাকাও, তবে আর আমাদের পরলোক কি ক'রে হয়, বল?

পাঁজা মহাশয় ভগ্নীদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের মুখচ্ছবি ভিক্ষুকের মতই সকরুণ এবং ত্রস্ত। তাহাদের মুখ দেখিয়া তাঁহার মমতা হইল, শুধু মমতাই নয়, তিনিই এ সংসারে তাহাদের সর্ব্বস্ব জানিয়া বেশ একটু খুশীও হইলেন, কিন্তু তবুও তিনি গৃহিণীর সম্মতি না লইয়া একেবারে সম্মতি দিতে পারিলেন না। বলিলেন, তা হ্যাঁ, দেখি ভেবে চিন্তে! মানে খরচপত্র তো আছে!

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, তোমার খুশী! আমি কে?

পাঁজা মহাশয় চিন্তিত হইয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন, তাই তো—!

দিন দশেক পরেই কিন্তু একটা সুমীমাংসা হইয়া গেল। ক্রোশ পাঁচেক দূরবর্ত্তী গ্রামে পাঁজা মহাশয়ের এক বিধবা শ্যালিকার বাড়ি। তিনি হঠাৎ সেদিন আসিয়া হাজির হইলেন। গালে মোটা মোটা দুই-দুইটা ডবল-খিলি পান দোক্তা সহযোগে, লবণাক্ত আনারসের মত অনবরত রসক্ষরণ করিতেছিল, তিনি কোঁত কোঁত করিয়া সেই রস গিলিতে গিলিতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিলেন, কই গা পাঁজা মশায়, কই গা?—বলিয়া পচ করিয়া এক ঝলক পানের পিচ ফেলিয়া দিলেন।

গৃহিণী পুলকিত হইয়া বলিলেন, কে, বেমলা? আয় আয়!

—উ-হুঁ, আগে পাঁজা মশাই কই, বল?

পাঁজা মহাশয় ঘরের ভিতর ছিলেন, তিনি পুলকিত হইয়া আসিয়া বলিলেন, আরে, এস এস, ছোটগিন্নী এস!। ওরে আসন দে রে, বসতে আসন দে।

ছোটগিন্নী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, নাঃ, তোমার আর আদরে কাজ নেই; ভালবাসার কথা জানা গেছে!

ত্রস্ত হইয়া পাঁজা বলিলেন, আরে আরে, হ'ল কি ছোটগিন্নী? কথাটাই বল আগে।

কেন? শিবপ্রতিষ্ঠে করছ, দিদি থাকবে তোমার বাঁয়ে, বলি ডান দিক কি তোমার খালি থাকবে নাকি?

গিন্নী হাসিয়া বলিলেন, তা, আমাদের বেমলা বলেছে বেশ! দুপাশে দুটি ছোট মন্দির, মাঝখানে তোমারটি একটু বড়, সে মানাবে খুব ভাল! বিমলা হাসিয়া বলিল, দুপাশে দুই কলাগাছ মধ্যিখানে জগন্নাথ!

অতঃপর গৃহিণী ও শ্যালিকার দুইপাশে দুই ভগ্নীকে স্থান না দেওয়াটা আর ভাল দেখাইল না! গৃহিণীও এবার বলিলেন, আহা, স্বামী নেই, পুত্তুর নেই, তুমি ছাড়া ওদের কে আছে? আর বাপু, মানাবেও খুব

ভাল! দুপাশে দুটি ছোট, তার পাশের দুটি আর একটু বড়, একেবারে মাঝে তোমারটি স-ব চেয়ে বড়। সারি সারি পাঁচটি মন্দির, পঞ্চবক্ত্রে স্মরেন্নিত্যং—বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া গৃহিণী প্রণাম করিলেন।

ছেলে সমস্ত শুনিয়া বলিল, তাই তো খরচ বেজায় বেড়ে গেল;—পাঁচ পাঁচটা মন্দির!

পাঁজা বলিলেন, ছোট ছোট মন্দির কর।

তাতেও তো নেহাৎ কম খরচ হবে না। মনে করেছিলাম সরকার-দের সম্পত্তিটা কিনব।

তবে না হয় ধান বিক্রয় কর।

ধান? ধানের কি দর আছে? তা ছাড়া ধান ধার দিলে এক বছরেই দেড়া হয়ে ফিরে আসবে।

তবে?

আমি বলছিলাম, পিসিমারা গয়নাগুলো দিন না! কিছুতো সাহায্য হবে। আর কাদার গাঁথনি ক'রে—তাতে খরচও কম হবে; বাকি যা লাগবে সে যা হোক ক'রে দোব আমরা।

গহনাই বা কি? মরা-সোনার কয়েকখানা পদ—কাঁকনি, বাজু, গলার মুড়কি মালা—এইমাত্র; সমস্ত বিক্রয় করিয়াও শ' চারেক টাকা হইল না, কুড়ি টাকা কম থাকিয়া গেল। তবুও তাহারই শোকে বিধবা দুইটি গোপনে ঘরের মেঝে ভিজাইয়া তুলিল।

যা'ক সে কথা। দেব পঞ্চানন পঞ্চমূর্ত্তিতে তো প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পাঁজা পাকা বন্দোবস্ত করিলেন, পাঁচ বিঘা নিষ্কর জমি দেবোত্তর করিয়া গ্রামের নবাগত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিহর ঘোষালকে অর্পণ করিয়া পূজক নিযুক্ত করিলেন। হরিহর ঘোষাল বংশানুক্রমে ফুল-বিল্বপত্র, আতপ ও গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে বাধ্য থাকিবে। ঘোষাল শুধু পাঁজাকেই দুই

হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল না, সে পঞ্চরুদ্রের পদতলেও লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, জয় আশুতোষ! তুমিই আমার অন্নদাতা, তুমিই আমার ঈশ্বর!

সে পরম ভক্তি সহকারে পূজা আরম্ভ করিল।

বিধবা ভগ্নী দুইটি নিত্য প্রণাম করে, গাওয়া ঘি আনিয়া শিবের অঙ্গে মাখাইয়া দেয়, চন্দন লেপন করে। গাঁজাও নিত্য প্রণাম করিয়া যান, বাড়ীতে কলা পাকিলে পাঁচটি শিবের জন্ত আসে, জমিতে শস্য ধরিলে শিবেরা পাইয়া থাকেন, প্রতি সন্ধ্যায় ছটাক খানেক করিয়া পাঁচ ছটাক দুধও পঞ্চরুদ্র পাইয়া থাকেন।

খাইয়া মাখিয়া পঞ্চজনে বেশ চিকন হইয়া উঠিলেন!

রাত্রে মধ্যবর্ত্তী রামরতনের শিব রত্নেশ্বর-রুদ্র বলেন, বলি কেমন লাগছে হে কমলেশ্বর?

গিন্নী কমলার শিব কমলেশ্বর বলেন, আঃ বুড়ো বয়েসে রস দেখ! রাতদুপুরে, এমন আরামের ঘুম ভাঙাচ্ছ।

ডান পাশ হইতে বিমলেশ্বর ফিক করিয়া হাসিয়া বলেন, মরণ তোমার! রসের আবার বয়েস আছে নাকি? আছি বেশ! আমার তো ভুঁড়িটা বাড়ছে দিন দিন।

একেবারে এপাশ হইতে এলোকেশীশ্বর বলেন, মাথার জটাগুলো কালো হয়ে উঠল হে, ঘি খেয়ে আর মেখে! গায়ের ফাটগুলো একেবারে ম'রে গেছে। বেঁচেছি হে, শরীর আর চড়-চড় করে না।

একেবারে ওপাশ হইতে মুক্তকেশীশ্বর বলেন, সন্ধ্যাবেলায় দুধটি খেয়ে মাথার গোলমালটা কিন্তু একেবারেই আমার কেটে গেছে! আর গাঁজার মুখে দুধটি যা লাগে, আহা—হা!

এবার বিমলেশ্বর বলেন, কই, তোমার কথা তো কিছু বললে না রত্নেশ্বর?

রত্নেশ্বর বলেন, সুখ সবই। তবে একটি দুঃখ আমার আছে। চন্দন যখন মাখি তখন গৌরীকে মনে প'ড়ে যায়।

অকস্মাৎ কমলেশ্বর ফোঁস করিয়া উঠেন, আ মরণ তোমার!

* * *

পঞ্চান্ন বৎসর পর।

কাল-প্রবাহের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পাঁজা মহাশয় নাই, কমলা বিমলা, এলোকেশী মুক্তকেশীও নাই। শুধু ইহারা কেন, সমগ্র পাঁজা-পরিবারই আজ ছত্রভঙ্গ; পাঁজাদের এত বড় বাড়িটা একটা প্রকাণ্ড মাটির ঢিপিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। রামরতন হইতে তৃতীয় পুরুষের প্রথমেই পাঁজা-বংশ মহাপ্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী গিয়া মোক্ষ লাভ করিল। সম্পত্তি গিয়া অর্শিল পাঁজাদের দৌহিত্র বংশে। তাহাদের বাসও নিকটেই, পাশের গ্রামে। হরিহর ঘোষালও গত হইয়াছে, তাহার পর তাহার পুত্রেরাও বিগত, এখন আছে তিন পৌত্র। এক পৌত্র গিরীন ঘোষাল, সে করে জমিদারী সেরেস্তায় গমস্তাগিরি; এক পৌত্র মহীন ঘোষাল, সে করে গুরুগিরি; অপর পৌত্র মণীন্দ্র ঘোষাল, সে খানিকটা জড়তাব্যাধি-যুক্ত, বুদ্ধির জড়তাও আছে, জিহ্বার জড়তা হেতু কথাও বেশ পরিষ্কার উচ্চারণ করিতে পারে না; সে-ই এখন ওই পঞ্চরুদ্রের পূজা করে। বলা বাহুল্য, তিন জনেই পৃথগন্ন, মণীন্দ্রের ভাগেই পঞ্চ বিঘা জমির সহিত পঞ্চরুদ্র পড়িয়াছেন।

কাদার গাঁথুনির মন্দিরগুলিতে পঞ্চান্ন বৎসরেই ফাট ধরিয়াছে; চারিপাশের রোয়াকগুলি তো নিঃশেষে বিলুপ্ত, ইটগুলির পর্য্যন্ত চিহ্ন নাই। বহুদিন পর্য্যন্ত ইটগুলি আশে-পাশে রাশীকৃত হইয়া পড়িয়াই ছিল। সে, হরিহর ঘোষালের পুত্রদ্বয়ের জীবিত-কালের ঘটনা। ঘোষালদের তখন উন্নতির মুখ, ঘোষালেরা দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া

নবান্ন উপলক্ষে অন্নপূর্ণাপূজা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিল। প্রথম বৎসর পূজার শেষে প্রতিমা-নিরঞ্জনের পর দিবসই অন্নপূর্ণা দেবীর গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য বনিয়াদ খোঁড়া হইল।

বড়ভাই বলিল, ভালই হ'ল, বাইরে বসবার দাঁড়াবার একটা জায়গা হ'ল। পূজো তো বছরে দু দিন।

ছোটভাই সায় দিয়া বলিল, এ আমার বহুদিনের সাধ দাদা। দত্ত-দের বৈঠকখানায় দাবা খেলতে যাই, মাঝে মাঝে এমন কথা বলে ছোট-লোক বেটারা! ওদের ওখানকার আড্ডা এইবার ভাঙব, দাঁড়াও।

বড়ভাই বলিল, তবে এক কাজ কর, দু-কুঠুরি ঘর হোক। পূজোর ঘরটা বড়, ওইটেতে সব বসবি দাঁড়াবি, আর পাশে একখানা ছোট ঘর, ও-খানাতে আমি আপনার সেরেস্তার কাগজপত্র রাখব, সাধন-ভজন করব।

সাধন-ভজন অর্থে অনেক কিছু, কিন্তু সে থাক। ঘর হইয়া গেল। ছোট বলিল, দাদা, মেঝেটা কোন রকমে বাঁধিয়ে ফেল। খরচ তো কিছু করতে হয় নি! তোমার গমস্তাগিরির কল্যেণে কাঠকুটো বাঁশ মায় খড় পর্য্যন্ত বাবুদের মহাল থেকে এল। কিছু খরচ কর!

বড়ভাই বলিল, আচ্ছা।

পরদিনই দেখা গেল, মজুর লাগিয়া ঝুড়িতে বহিয়া পঞ্চরুদ্রতলার রোয়াক-ভাঙা ইঁট ঘোষালদের বাড়ীর দিকে লইয়া চলিয়াছে।

রাত্রে কমলেশ্বর বলিলেন, দেখছ ঘোষাল বেটাদের কাণ্ড!

বিমলেশ্বর ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু অন্নপূর্ণার মন্দিরের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে যে!

রত্নেশ্বর বলিলেন, অন্নপূর্ণা এলে তো বাঁচি! খাওয়া দাওয়ার বড়ই অসুবিধে হচ্ছে হে!—আতপ বড্ড কমিয়ে দিয়েছে! জল তো কুশীতে

ক'রে এতটুকু! ঘি চন্দন তো দেয়ই না! গা হাত পা এমন চড়-চড় করছে!

এলোকেশীশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার পাশেই একটা সার-ডোবা করেছে ঘোষালেরা। গন্ধে তো আর বাঁচি না!

মুক্তকেশীশ্বর চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার ঘরের কোণের ফাটলে বিছুটীর গাছ হয়েছে, লতাটা এসে গায়ে জড়িয়েছে, অহরহ জ্বালাতে আমি জ্ব'লে মলাম! ওঃ এর চেয়ে সাপের জ্বালা ভাল।

রত্নেশ্বর কটমট করিয়া চাহিয়া বলিলেন, তবে একবার উঠব নাকি?

বিমলেশ্বর বলিলেন, অন্নপূর্ণা সবে এল। ওরাই অন্নপূর্ণাকে আনলে, এখন কি অরসিকের মত কাজ করা ঠিক হবে?

কমলেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা ক'রেই ম'ল!

এখন মণীন্দ্র ঘোষাল পঞ্চরুদ্রের সেবক।

প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে সে একটা ঘটিতে জল, একটা ঠোঙাতে একমুঠা আতপ ও কতকগুলা বেলপাতা লইয়া আসিয়া মন্দিরের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করে। কিন্তু কি যে সে বলে তা সেই জানে, ভাষাটা সংস্কৃত, কি চীনে, কি পুস্তু, কি হনোলুলুর ভাষা—বোঝা যায় না। কিন্তু চীৎকার সে করে খুব।

তবে একটা কাজ করিয়াছে, মুক্তকেশীশ্বরের অঙ্গের বিছুটি সে ঘুচাইয়াছে। একদিন বিছুটি তাহার গায়েই লাগিয়াছিল। মুক্তকেশীশ্বর তো মণীন্দ্রের উপর মহা সন্তুষ্ট, চায় না তাই, চাহিলে বোধকরি পৃথিবীর সাম্রাজ্যই তাহাকে দান করিতে পারেন।

মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর বলেন, আচ্ছা কি মন্ত্র ও ব'লে বল তো?

মুক্তকেশীশ্বর বলেন, যাই বলুক, ভক্তি ওর খুব। ওকে কিছু দিতে হবে।

কিন্তু তাঁহারা দিবার পূর্ব্বেই একদিন মণীন্দ্র নিজেই তাহার প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া বসিল। একদিন গভীর রাত্রে সে পঞ্চরুদ্রের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর :ঠক করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কিছু মনে ক'র না বাবারা। ঘরের জান্‌লা হচ্ছে না আমার।

রত্নেশ্বর অবাক হইয়া বলিলেন, কি বলে হে?

ততক্ষণে মণীন্দ্র এলোকেশীশ্বরের মন্দিরের দরজা দুই পাট খুলিয়া লইয়া কাঁধে চাপাইয়াছে। ক্রমে বিমলেশ্বর, রত্নেশ্বর, কমলেশ্বর, মুক্তকেশীশ্বর সকলের দরজাই সে একে একে খুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

রত্নেশ্বর বলিলেন, এ কি রকম হ'ল?

বিমলেশ্বর বলিলেন, যা হ'ল তাই হোক গে। কিন্তু বসন্তের হাওয়াটি কেমন দিচ্ছে বল তো?

রত্নেশ্বর বলিলেন, যা বলেছ! শরীরটে যেন জুড়িয়ে গেল! অন্নপূর্ণাকে ডেকে একটু গল্প করলে হয় না?

কমলেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, আমি উঠে যাব কিন্তু!

দুঃখিত হইয়াছিলেন এলোকেশীশ্বর, সার-ডোবার গন্ধটা মুক্তদ্বার-পথে অভুগ্র্য হইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

মুক্তকেশীশ্বর খুশি হইয়া ভাবিতেছিলেন, যাক, কিছু পেলে বেচারা। কিন্তু সামান্য ঐ কয় জোড়া দরজা লইয়া মণীন্দ্র সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। প্রত্যহ রাত্রে গ্রাম নিশুতি হইলে সে একটা ঝুড়ি ও একটা শাবল লইয়া আসিয়া মন্দিরের পিছন দিকের ভাঙা ভিতে শাবল চালাইয়া ইঁট বাহির করিয়া নিয়মিত দুই চার ঝুড়ি করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। তাহার ঘরের মেঝে বাঁধাইতে হইবে।

আর রুদ্রদেবতার সহ্য হইল না। অকস্মাৎ একদিন মাথা নাড়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে মণীন্দ্রের কোন ক্ষতি হইল না, রুদ্রদেবতাদের

মস্তকান্দোলনে মন্দিরগুলিই শুধু কাঁপিতে কাঁপিতে হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

মন্দির-পতনের ফলে রুদ্রদেবতার রোষে মারা গেল গোটা তুই ছাগল, সার-ডোবার মধ্যে একটা ঢোঁড়া সাপ আর বহু কীট পতঙ্গ। একটা মুচিদের মেয়ে মন্দিরের পিছনে পতিত জায়গাটায় বুনো শাক তুলিতেছিল, একটা ইঁট ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ে লাগিল, সে খানিকটা জখম হইল।

মন্দির-পতনের শব্দে বহুলোক আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মণীন্দ্রও ছিল, সে বিপুল পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ডয় বিঠ্যনাট! অর্থাৎ জয় বিশ্বনাথ।

বহুক্ষণ পর রত্নেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, বলি ওহে, শুনছ সব?

কমলেশ্বর ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, শুনছ সব? কেমন, বার বার বললাম, ক্ষ্যাপামি ক'র না; তুমিই ত ক্ষ্যাপালে সব!

বিমলেশ্বর বলিলেন, উঃ, ভাগ্যিস জটার বোঝাটা বেশ মোটা হয়ে আছে, তাই তো রক্ষে! নইলে মাথা আর কারু থাকত না।

এলোকেশীশ্বর বলিলেন, আমার হাতে বড্ড লেগেছে!

মুক্তকেশীশ্বর বলিলেন, এ যে ইঁট চাপা প'ড়ে দম বন্ধ হয়ে গেল!

রত্নেশ্বর বলিলেন, কুম্ভক ক'রে ব'স।

পঞ্চরুদ্র কুম্ভক করিয়া বসিলেন। ভাগ্য ভাল যে, কয়েক দিনের মধ্যেই এ অবস্থার অবসান হইল। ইঁট সমান অংশে ভাগ করিয়া কিছু লইল মণীন্দ্র, কিছু লইল মহীন্দ্র, কিছু লইল গিরীন্দ্র। গ্রামের লোকে আসিয়া ধরিল, রাস্তার ওই সাঁকোটার জন্য আমরা কিছু নেব।

তাহারাও কিছু লইল। মহীন্দ্র ড্রেনটা পাকা করিয়া ফেলিল, গিরীন্দ্রের ভাগের ইঁটগুলি লইয়া গেল চাষাদের মেয়ে সত্য-দাসী। সে

তাহার ঘরের মেঝেটা বাঁধাইয়া ফেলিল। গিরীন্দ্র রোজ সন্ধ্যায় সেখানে যায়, গল্প করে, তামাক খায়, আসিবার সময় সত্যদাসী এক বাটি ঘনাবর্ত্ত দুধ না খাওয়াইয়া ছাড়ে না।

* * * *

আরও পনেরো বৎসর পর।

মণীন্দ্র কৈলাসে গিয়াছে। তাহার একমাত্র পুত্র জীবনকৃষ্ণ এখন রুদ্র দেবতার সেবক। পঞ্চরুদ্র এখন উন্মুক্ত আকাশের তলে রৌদ্র বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম মাথায় করিয়া বোধ করি যোগমগ্ন। কষ্টিপাথরের নিকষ কালো রঙের উপর ধুলা পড়িয়া পড়িয়া ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আশে-পাশে ইট-চুনের কোন চিহ্ন নাই, এক-একটা মাটির ঢিপির উপর কেহ কাৎ হইয়া, কেহ ঈষৎ হেলিয়া, কেহ বা কোনরূপে সোজা হইয়া বসিয়া আছেন। বিমলেশ্বর তো একেবারে শুইয়া পড়িয়াছেন। জীবন কৃষ্ণ স্নান করিয়া কতকগুলা বেলপাতা তুলিয়া লয়, সিক্তবস্ত্রেই পথে দাঁড়াইয়া বেলপাতা ছুঁড়িয়া দেয়, নমঃ শিবায় নমঃ। গামছার খুঁটে অর্দ্ধমুষ্টি অপেক্ষাও কম আতপ-চাউলের খুদ বাঁধা থাকে, তাহাই চারিটি করিয়া ছিটাইয়া দিয়া আসে। এক এক রুদ্রের ভাগে পড়ে গুটি বিশ পঁচিশেক আতপকণা।

জীবন একদিকে পূজা করিয়া যায়, আর একদিক হইতে কয়টা ছাগল সেগুলি খাইতে খাইতে আসে। জীবনের পূজার সময় তাহাদের যেন মুখস্থ হইয়া গেছে। ছাগলের বাচ্চাগুলা আবার লাফাইয়া রুদ্রদেবতার মাথায় চড়িয়া নাচে।

আরও নাচে কয়টি ছেলে; গিরীনের ছেলে তাহাদের মুখপাত্র। তাহারা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এক এক জন এক এক রুদ্রের ঘাড়ে চাপিয়া ভাঙা ডাল দিয়া দেবতাকে পিটিতে পিটিতে বলে, চল চল, হেট হেট!

কাহারও চোখে পড়িলে সে ধমক দিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেয়।

নিঃসন্তান জীবনকৃষ্ণ কিন্তু দেখিলেও কিছু বলে না। সে মনে মনে রুদ্রদেবতাকে নিবেদন করে, নাও বাবা রুদ্রদেব, নাও বেটাদের! নির্ব্বংশ হোক সব!

দয়াময় আশুতোষ কিন্তু শিশুর অপরাধ গ্রহণ করেন না! জীবন মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলে, শিব না কচু! সেদিন সে বেলপাতার পরিবর্ত্তে আগাছার পাতা ছিটাইয়া দেয়।

ছেলেদের কাণ্ডটা একদিন চোখে পড়িল গিরীনের। সে শিহরিয়া উঠিয়া নিজের ছেলে লক্ষ্মণকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়া বলিল, ঠাকুর! দেবতা! ও করলে পাপ হয়। বাবারে! ঠাকুরকে পেন্নাম করতে হয়।

লক্ষ্মণ উৎসাহের সহিত বলিল, পূজো করব তবে, বেশ বাবা!

হ্যাঁ, পূজো করতে হয়।

শালুক-ডাঁটা তুলে এনে বলিদান দোব, বেশ বাবা।

আচ্ছা, তাই দিও বরং।

আর বেসজ্জন?

গিরীন চমকিয়া উঠিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিল। তারপর একবার চাহিল নিজের বাড়ীর দিকে! সদর রাস্তা হইতে তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত একটা গাড়ির রাস্তার বড়ই অভাব, ধান তুলিতে অসুবিধার অন্ত থাকে না। পথ জুড়িয়া বসিয়া আছেন পঞ্চরুদ্র। মোড়ের ওই দুইটা যদি—

অসহিষ্ণু লক্ষ্মণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, বেসজ্জন করব না বাবা?

চুপি চুপি গিরীন বলিল, দিস্ ক'রে! এই দেখ, এই এপাশের দুটো বুঝলি? ভর্ত্তি দুপুরবেলা দিস; নইলে লোকে বকবে!

দিন দুয়েক পরেই পঞ্চদশনেত্র পঞ্চবক্ত্র মাত্র নবনেত্র ত্রিবক্ত্র হইয়া বসিয়া রহিলেন। মুক্তকেশীশ্বর এবং কমলেশ্বর শীতল জলশয়ানে শুইয়া ভাবিলেন, 'প্রলয়পয়োধি জলে' তো মন্দ নয়, শরীরতো বেশ জুড়াইয়া

গেল। জীবনকৃষ্ণও উচ্চবাচ্য করিল না। সঙ্গে সঙ্গে সে পাঁচবিঘা নিষ্কর জমির দুই বিঘা বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তাহার টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কাঁদিল শুধু বেনেবুড়ী। রোজ সকাল সন্ধ্যায় সে পঞ্চরুদ্রকে প্রণাম করিয়া যাইত। সেদিন সন্ধ্যায় সে পঞ্চদেবতার স্থলে তিনজনকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন উদ্দেশ না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, কি অপরাধ করলাম বাবা? রোজ পাঁচটি ক'রে পেন্নাম করতাম, দুটি ক'রে যে আমার বাকি থেকে যাবে বাবা!

জীবন একদিন রাত্রে এলোকেশীশ্বরকে নিজেই একটা পুকুরে ফেলিয়া দিয়া আসিল। তাহার আরও টাকার প্রয়োজন।

* * * *

আরও বৎসর পঁচিশেক পর।

রত্নেশ্বর আর বিমলেশ্বর বসিয়া বসিয়া ভাবেন, মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার মত অভিশাপ আর নাই।

জীবনকৃষ্ণ এখন বৃদ্ধ, সে-ই এখনও পূজা করে, বেলপাতা ছিটাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া বলে, গতি কর পরমেশ্বর!

দুই রুদ্র আশীর্ব্বাদ করেন, মৃত্যুঞ্জয় হও, অমর হও তুমি।

তবে রুদ্রদেবদ্বয়ের এই অবস্থার মধ্যেও হঠাৎ একটা সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে, এক পরম ভক্ত, জুটিয়াছে। গিরীনের ভাই মহীন, তাহারই এক পৌত্র। সে রুদ্রদেবতার মহা ভক্ত। সে চুল রাখিয়াছে, দাড়িগোঁফ রাখিয়াছে, গাঁজা খায়, পারদ এবং লতাপাতা লইয়া সে তামা হইতে সোনা প্রস্তুত করে, সে-ই আসিয়া গভীর রাত্রে দুই রুদ্রের সম্মুখে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে গাঁজা সাজে, রুদ্র-দেবতাদের ভোগ দেয়; তারপর নিজে প্রসাদ খায়।

মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর বলেন, দেখ, কিসের পর কি হয়, সে কি বলা যায়? গাঁজাটা কিন্তু ছোকরা বানায় ভাল হে!

বিমলেশ্বর বলেন, বম্ বম্ বম্, হরি হরি হরি হরি!

রত্নেশ্বরও গাল বাজান, বম্, বম্, বম্!

অকস্মাৎ একদিন পঞ্চরুদ্রতলায় তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইয়া গেল। গিরীনের পুত্র সেই লক্ষ্মণের সহিত তাহার ভ্রাতা রামদাসের বিবাদ বাধিল। নিতান্ত অকারণে ঝগড়া—দুই বউয়ের ঝগড়া ক্রমশ বিপুলতর হইয়া ভাগাভাগির ঝগড়ায় পরিণত হইয়াছে। এখন ঝগড়া সেই রাস্তাটা লইয়া; মূল বাড়িটা এখন লক্ষ্মণের ভাগে পড়িয়াছে, রামদাসের বাড়িটা লক্ষ্মণের বাড়ি পার হইয়া যাইতে হইবে। লক্ষ্মণ বলিতেছে, এ রাস্তা তোমার নয় আমার।

রামদাস বলে, বাঃ, এ রাস্তা তো পৈতৃক।

পৈতৃক তো এই আমার বাড়ির দোর পর্য্যন্ত। তারপর এ জায়গাটা তো আমার। এ জায়গার ওপর দিয়ে তোমাকে রাস্তা কেন দোব হে? তুমি কি আমার পীর নাকি? ওঃ, বলে যে সেই, গরজের পা মাথার ওপর দিয়ে!

পাঁচজন গ্রামের লোকও আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহারাও লক্ষ্মণকে সমর্থন করিয়া বলিল, সে একশো-বার। যতটুকু পৈতৃক রাস্তা ততটুকু সাজার বটে। কিন্তু তারপর ওর নিজের জায়গা যদি ও না দেয়?

রামদাস বলিল, বেশ, ও জায়গাটা আমার সঙ্গে বদল করুক।

লক্ষ্মণ বলিল, তা যদি আমি না করি?

শেষ পর্য্যন্ত রামদাস বলিল, আচ্ছা, রাস্তা ভগবান দেবেন আমাকে।

গভীর রাত্রি।

রামদাস চুপি চুপি রুদ্রতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ওই শিব দুইটাকে সরাইতে হইবে। সে ওই দিক দিয়া রাস্তা বাহির করিবে! মালকোঁচা মারিয়া কাপড় সাঁটিয়া আসিয়াই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একি, কে? ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, নিথর মূর্ত্তি! সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পরক্ষণেই আলোক জ্বলিয়া উঠিল। পাগল দেশলাই জ্বালিয়া গাঁজার জন্য টিকা ধরাইতেছিল। মুহূর্ত্তে রামদাস ক্রোধে যেন উন্মত্ত হইয়া গেল।

হারামজাদা, গেঁজেল, শুয়ার, পাজী, ছুঁচো!

সে দুমদাম করিয়া কিল চড় লাথি মারিয়া পাগলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। পাগল কিছুক্ষণ হতভম্বের মত মার খাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

রামদাস একটু হাসিল। তারপর প্রথমেই বিমলেশ্বরকে ঘাড়ে তুলিয়া সে একটু চিন্তা করিয়া পুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া রত্নেশ্বরকে ঘাড়ে তুলিল।

পরদিন জীবনকৃষ্ণ দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে পাঁচ বিঘার বাকি দুই বিঘার খরিদ্দার খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পরদিন রামদাস রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। জীবনকৃষ্ণ আসিয়া বাধা দিল। সে বলিল, আমি পুলিশে খবর দোব। তুমিই শিব কোথা ফেলে দিয়েছ। নইলে আমাকে কিছু দাও!

রামদাস মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল, আর বাকি তিনটে? আর জমিগুলো যে বেচে খেলি, সে জমি আন।

জীবন ভড়কাইয়া গেল।

ইতিমধ্যে গোবিন্দ ঘোষ সটান পাশের গ্রামে গিয়া বাঁড়ুজ্জেবাবুদের নিকট হাজির হইল, বলিল, জায়গা তো আপনাদের ধরুন পাঁচটা মন্দির, প্রত্যেক মন্দিরের মেঝে চার হাত, দেওয়াল দু হা'ত, আর বারান্দা তাও এক-এক পাশে দু হাত ক'রে চার হাত, একুনে দশ হাত, এই পাঁচ দশে পঞ্চাশ হাত লম্বা, আর হাত দশেক চওড়া, এ জায়গাটা তো আপনাদের বটেই। ওটা বন্দোবস্ত করলে মোটা টাকা হবে আপনাদের।

বাঁড়ুজ্জে-বাবুরাই এখন পাঁজাদের সম্পত্তির মালিক, তাহাদের দৌহিত্রদের যথাসর্ব্বস্ব তাঁহারা নিলামে খরিদ করিয়াছেন। বাবুরা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়!

ঘোষ বলিল, আমিই একশো টাকা দোব। আজই লেখাপড়া ক'রে দিন, দখল দিয়ে দিন, সঙ্গে সঙ্গে টাকা!

বাবুরা বলিলেন, আন কাগজ।

লেখাপড়া হইয়া গেল। ঘোষ বলিল, দখল দিয়ে দিন।

আচ্ছা, কালই আমাদের লোক যাবে। আর নায়েববাবু, জীবন ঘোষালকে একবার ডেকে পাঠান তো!

জীবন আসিতেই বাবুরা সেই পাঁচ বিঘা জমি দাবি করিয়া বলিলেন, জমি বেচেছ, টাকা ফেল। নইলে নালিশ ক'রে তোমাকে জেলে দোব। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এই কাণ্ড! রামদাসকেও ছাড়ব না। লক্ষ্মণের ওই পথও বন্ধ করব।

জীবন যেন অগাধ জলে পড়িল। সে আসিয়া রামদাসকে বলিল,

বাবুরা বলছে, 'জায়গা তো দখল করবই, তা ছাড়া রামদাসকে আর তোমাকে জেল দোব। লক্ষ্মণেরও পথ বন্ধ করবে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে জাদুমন্ত্রে ঘোষাল-বাড়ির সমস্ত ঝগড়া মিটিয়া গেল। তাহারা বলিল, আরে মামলা তো সাক্ষীর মুখে। সে দেখা যাবে। এখন লাঠি ঠিক ক'রে রাখ, দেখব কেমন ক'রে কাল জায়গা দখল করে।

* * *

সন্ধ্যায় বেনেবুড়ী কাঁদিয়া ফিরিয়া গেল।

গভীর রাত্রে পাগল শূন্য রুদ্রতলায় আসিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে উঠিল। তারপর বড় পুকুরটায় আসিয়া নামিল।

হ্যাঁ, এইখানেই তো! এই তো! আর একটি কোথায় গেল? আরে, আরে, অই, এ যে অনেক! হাঁ, গাজনের ভক্তেরা তো বলে শিবের বাচ্চা হয়।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালেই পঞ্চরুদ্রতলায় সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদিকে বাঁড়ুজ্জে-বাবুদের বরকন্দাজ দল, অপরদিকে ঘোষালরা সবংশে, চারিদিকে বিস্মিত জনতা, মধ্যে পঞ্চরুদ্রতলায় সারি পঞ্চরুদ্র বিরাজমান। সমস্ত জনতা নির্ব্বাক। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বেনেবুড়ী জনতা ঠেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, আঃ বাবা! ছলনাময় যে তোমাকে বলে তা মিথ্যে নয়! ফিরে আসতে পারলে বাবা! সম্মুখে আসিয়া সে ঠক-ঠক করিয়া পাঁচটা প্রণাম করিয়া জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, পঞ্চরুদ্দুতলা বাবা, পেন্নাম কর সব পেন্নাম কর।

পাগল দূরে একটা গাছতলায় বসিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছিল।

—'ত্রিভি'

'লাগ' ও 'ফাঁস' শব্দ দুটি নাগ ও পাশের অপভ্রংশ রূপ নয়। দুইটি আভিধানিক শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং দুটি ব্যক্তির নাম। 'লাগ' অর্থে লাগাইয়া দেওয়া বা বাধাইয়া দেওয়া, আর 'ফাঁস' অর্থে ফাঁসাইয়া দেওয়া। আরও একটু খুলিয়া বলা দরকার, বিবাদই হউক আর বন্ধুত্বই হউক, একজন বাধাইয়া দেন অর্থাৎ লাগাইয়া দেন, অপরজন সে বিবাদ বা বন্ধুত্ব ফাঁসাইয়া দেন। বিবাদ ফাঁসাইয়া মিটমাট হয় বন্ধুত্ব বাধে; বন্ধুত্ব ফাঁসাইয়া বিবাদ বাধে; মোট কথা, পৌনঃপুনিক নিয়ম অনুযায়ী ইহা চলিতেই থাকে। তাহার উপর দেশে ষষ্ঠীপূজার সমারোহ এখনও একবিন্দু কমে নাই, লোক-সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে, সুতরাং উপলক্ষ বা পক্ষের অভাব হয় না। তবে কে যে 'লাগ' আর কে যে 'ফাঁস'— এ নিরাকরণ এখনও হয় নাই, বোধ হয় এ জীবনে হইবেও না; কারণ ইনি যেখানে বিবাদ লাগাইয়া দেন, উনি সেখানে ফাঁসাইয়া দেন; আবার উনি যেখানে লাগাইয়া দেন, ইনি সেখানে 'ফাঁস'-মূর্তিতে আবির্ভূত হন।

পরস্পরের বাড়ি আট মাইল দূরবর্ত্তী দু'খানি গ্রামে। একজন কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শাক্তবংশের সন্তান। কালীচরণের আবক্ষ-লম্বিত দাড়ি, বড় বড় গোঁফ, বড় বড় চুল; কপালে সে একটা পয়সার মত আকারের সিঁদুরের ফোঁটা কাটে, গলায় ইয়া মোটা এক রুদ্রাক্ষের মালা পরে এবং মোটা গলায় মধ্যে মধ্যে ডাকে— কালী! কালী! সে ডাক শুনিলে মনে হয়, কালী কালীচরণের বদ্ধ কালা ঝি। পৈতৃক ব্যবসায় গুরুগিরি, তাহার উপর ভাগ্য ক্রমে জুটিয়াছে এই লাগ-ফাঁসের ব্যবসায়।

অপরজন—রাধাচরণ, বৈষ্ণবধর্ম্মী ব্রাহ্মণবংশের সন্তান, উপাধি গঙ্গোপাধ্যায়। রাধাচরণ কিন্তু কেশধর্ম্মী নয়, মুখে তাহার দাড়ি-গোঁফের চিহ্ন মাত্র নাই, মাথার চুল সে খুব ছোট করিয়া ছাঁটে, কেবল মধ্য-মস্তকে পরিপুষ্ট লম্বা টিকি পাদপহীন দেশের এরণ্ডের মত ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে থাকে। গলায় চার ফের মোটা তুলসীর মালা, কপালে নাকে তিলকমাটির ফোঁটা ও বুকে হাতে পদচিহ্নের ছাপে রাধাচরণ বিশোভিত। সেও মধ্যে মধ্যে ডাকে, রাধে—রাধে! মোলায়েম গলায় সুরের একটি রেশ ডাকের মধ্যে বেশ বোঝা যায়। সম্মুখের পথে সে সময় জলের কলসী লইয়া সিক্তবস্ত্রে যে সব পল্লীকন্যা বা বধূরা যায়, তাহারা আত্মগতভাবেই বলে, মরণ! এত লোক মরে—। বাকিটা আর শোনা যায় না, মৃদু স্বর দূরত্ব হেতু আর ভাসিয়া আসে না। রাধাচরণেরও পৈতৃক ব্যবসায় গুরুগিরি, তাহার উপর এই লাগ-ফাঁসের ব্যবসায়।

একজন সাবমেরিন, অপরজন বোমাবর্ষী এরোপ্লেন। কালীচরণ কারণ-সলিলে অহরহঃই নিমজ্জমান; রাধাচরণ বৈষ্ণব, গঞ্জিকা-প্রসাদাৎ সে ব্যোমমার্গী। আবার উভয়েই উভয়ের পরমাত্মীয়, উভয়েই উভয়ের ভগ্নীপতি অর্থাৎ উভয়েই উভয়ের শ্যালক।

প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে একটি কায়স্থ জমিদারবংশকে উপলক্ষ করিয়া এই 'লাগ-ফাঁস'-লীলা আরম্ভ হইয়া ছিল। একই বাড়ি ভাঙিয়া দুই বাড়ি, এক বাড়ির মালিকের ছিল নেড়ানেড়ীর উপর প্রচণ্ড ক্রোধ, অপরজনের ছিল মাতালের উপর বিষম বীতরাগ। ফলে পারলৌকিক সদ্গতির জন্য প্রথমপক্ষ শরণ লইলেন কালীচরণের। কালীচরণ, বলিল মাভৈ!

অপর পক্ষ রাধাচরণের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পায়ের

খুলা স্থূপ করিয়া মুখে এবং ভক্তিভরে মাথায় বুলাইয়া জোড় হাত করিয়া বলিল, আমাকে পার করতেই হবে।

রাধাচরণ গদ্গদ হইয়া বলিল, রাধারাণী ভরসা!

সদ্গতি ইহলোকেই আরম্ভ হইল। দুই পক্ষেরই দীক্ষা হইল একই দিনে একই স্থানে, পিতৃপুরুষের এজমালি ঠাকুর-বাড়িতে। ঠাকুর বাড়ির এক দিকে কালীমন্দির, অপর দিকে গোবিন্দজীর আনন্দ নিকেতন; উভয় দেবতার মন্দিরের সম্মুখে এক প্রশস্ত নাটমন্দির। সন্ধ্যায় উভয় পক্ষেরই গুরু-শিষ্যে আপন আপন ইষ্টদেবতার মন্দির-দুয়ারে বসিয়া স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিবার কল্পনা করিতেছিল। রাধাচরণ ও কালীচরণ পরস্পরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, কারণ কেহ কাহারও মুখ দেখিত না। সে কথা পরে বলিব। রাধাচরণ অকস্মাৎ নাক সিঁটকাইয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস টানিয়া বলিল, উঃ, এমন দুর্গন্ধ কিসের হে?

মাথা চুলকাইয়া শিষ্য বলিল, আজ্ঞে, ও বাড়ির ঠাকুর মশায় 'কারণ' করছেন।

বিষম ঘৃণায় ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া রাধাচরণ বলিল, রাধে, রাধে, ছি-ছি-ছি! প্রভু বিরাজমান থাকতে এই অনাচার এখানে! তারপর সন্ধ্যায় যে রকম ঢাকের শব্দ? কাল থেকে তুমি এখানে সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা কর।

শিষ্য উৎসাহিত হইয়া বলিল, যে আজ্ঞে।

গাঁজার কল্কের গোড়ায় গোলাপজলে ভিজানো ন্যাকড়া জড়াইতে জড়াইতে রাধাচরণ বলিল, আর ওই ঘৃণিত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটা বন্ধ করার প্রয়োজন বাবা। রাধাগোবিন্দ ও গন্ধ সহ্য করতে পারেন না।—বলিয়া চোঁ করিয়া টান মারিয়া কুম্ভক করিয়া দম চাপিয়া বসিয়া

রহিল। তারপর 'ফু' করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া কল্কেটি শিষ্যের হাতে দিল, বলিল, সেই জন্যে প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল, প্রভু আমার যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে আছেন। সন্ধ্যায় তুমি প্রভুর মন্দিরে ত্বরিতানন্দ ভোগের ব্যবস্থা কর; খুব সুগন্ধী ষোড়শাঙ্গী ধূপের ব্যবস্থা কর, যেন ওই পদার্থটার গন্ধ প্রভুর কানে আর না যায়, মানে নাকে।

শিষ্য আরও খানিকটা উৎসাহিত হইয়া বলিল, তাই করব আমি।

গুরু এবার বলিলেন, কিন্তু কই, তুমি তো ত্বরিতাতন্দের প্রসাদ নিচ্ছ না। না না না, ওতে তুমি লজ্জা ক'র না। দেবভোগ্য বস্তু, দেখবে, জপ করতে কত একাগ্রতা আসে মনে।

শিষ্য সলজ্জভাবে মুখটি ঈষৎ ফিরাইয়া চোঁ করিয়া দম টানিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরই লালচে চোখ পিটপিট করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠিক বলেছেন আপনি, প্রভু আমার বিমর্ষ হয়েই আছেন।

পরদিন সন্ধ্যায় মহাসমারোহে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বারান্দায় গুরু-শিষ্যে ত্বরিতানন্দের ভোগ দিতেছিল। দশ বারোটি ধূপকাঠির মাথায় ধোঁয়া উঠিতেছে, সে বস্তুটার গন্ধ আজ সত্যই চাপা পড়িয়াছে।

ওদিকে কালীমন্দিরের দুয়ারে 'কারণ' করিতে করিতে কালীচরণ খোলের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া আরক্ত চোখে বলিল, একি অনাচার। খোলের শব্দে যোগমায়ার যোগভঙ্গ হবে যে! বন্ধ কর।

শিষ্য বিব্রত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, ওরা বলছে, তা হ'লে এখানে ঢাক বন্ধ করতে হবে।

হুম্। চোখ পাকাইয়া ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া হুঙ্কার দিবার ভঙ্গিতে কালীচরণ বলিল, হুম্। সঙ্গে সঙ্গে এক পাত্র কারণ ঢালিয়া পান করিয়া শিষ্যের পাত্রও পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া বলিল, পান কর।

আবার একবার অকস্মাৎ বলিল, হুম্। তারপর বলিল, উত্তম, তুমি মা কালীর দরবারে বলির ব্যবস্থা কর।—বলিয়াই অভ্যাসমত হাঁক মারিয়া ডাকিয়া উঠিল, কালী—কালী!

শিষ্য একটু দ্বিধাভরে বলিল, আজ্ঞে, বলির প্রথা তো প্রচলিত নেই, এজমালি নাটমন্দির, ওরা যদি বাধা দেয়।

কালীচরণ হাঁক দিয়া উঠিল, মাভৈ!

পরদিন দ্বিপ্রহরে ঢাকে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। রাধাচরণ চমকিয়া উঠিয়া, বলিল, বাবাজী, এ কি ব্যাপার? বাজনাটা যে কেমন কেমন মনে হচ্ছে!

শিষ্য কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একজন কর্ম্মচারী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, আজ্ঞে বাবু, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। ও বাড়ির কর্ত্তা কালীমন্দিরে বলি দিলেন আজ।

বলি? বলি কি?

আজ্ঞে, পাঁঠা।

হা গোবিন্দ!—বলিয়া রাধাচরণ সেইখানেই গড়াইয়া পড়িল। নাটমন্দিরে তখন কালীচরণ পরমানন্দে সিংহনাদে গান ধরিয়াছে—

ও মা দিগম্বরী, নাচ গো!

রাধাচরণ শিষ্যকে বলিল, বলি বন্ধ করতে হবে। মোকদ্দমা কর তুমি। যা কখনও নেই, তা হ'তে পারে না। আমি জানি, হাইকোর্টে মোকদ্দমা হয়েছে, তাতে শাক্তের দেবীমন্দিরে, এক অংশীদার বৈষ্ণবমন্ত্র নেওয়ায় তার পালায় সময় বলি বন্ধ হয়েছে। আর এ বলি যখন কখনও নেই, তখন বলি হতেই পারে না।

শিষ্যও মাতিয়া উঠিয়া ছিল, একে জমিদার, তায় জাতি-বিরোধের গন্ধ, সর্ব্বোপরি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই গুরুর প্রসাদ পাইয়াছে। সে বলিল, আপনি আমার গুরু; আপনার কাছে শপথ করছি, এ অনাচার আমি বন্ধ করবই। দেখুন, একটা ভাল দিন দেখুন—

বাধা দিয়া রাধাচরণ বলিল, গুরুর সঙ্গে মঘা-ত্র্যহস্পর্শে যাত্রায় বাধে না। কালই চল, আমি তোমার সঙ্গে যাব। দিনও অবশ্য কাল খুব ভালই—সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।

শিষ্য কৃতার্থ হইয়া গেল। রাধাচরণ আবার গাঁজা লইয়া বসিল। ব্যোমমার্গী বোমাবর্ষী এরোপ্লেন উড়িল।

শিষ্যের নায়েব বলিল, মামলার চেয়ে আপনারা দুই গুরুদেবে মিলে একটা মীমাংসা ক'রে দিন—

বাধা দিয়া প্রচণ্ড ঘৃণাভরে রাধাচরণ বলিল, ও পাপিষ্ঠের আমি মুখ দেখি না।

কালীচরণের শিষ্য একটু চিন্তিত হইয়াই সংবাদটা দিল। কালীচরণ হা হা করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, এতেই তুই ভয় পেয়ে গেলি বেটা? মাভৈ রে বেটা, মাভৈ! চল, দেখি, আমার সর্ব্বনাশী ন্যাংটা বেটী কি বলে দেখি! নিয়ে আয় কারণ।

কারণ পান করিয়া শিষ্যকে প্রসাদ দান করিয়া বলিল, দেখ, মায়ের হাসিটা দেখ! বলিয়া নিজেই খল খল করিয়া হাসিয়া সারা হইল। শিষ্য মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই মা হাসিতেছেন। সে গুরুর পায়ের ধুলা মাথায় লইল।

কালীচরণ বলিল, লাগিয়েছে মোকদ্দমা, লাগাতে দে, তিন তুড়িতে আমি ফাঁসিয়ে দোব। হাইকোর্টের নজির আছে, শাক্তের বাড়িতে

এক সরিক বৈষ্ণব হওয়ায় তার পালায় বলি বন্ধ হয়েছে। তখন সরিক শাক্ত হ'লে, তার পালাতেই বা বলি প্রচলন হবে না কেন শুনি?

শিষ্য আর এক পাত্র কারণ পান করিয়া বলিল, ফিন কাল বলি দেঙ্গে জোড়া পাঁঠা।

কালীচরণ হাসিয়া বলিল, এক খোঁচাতে মামলার তলা ফাঁসিয়ে দোব, ভাবছিস কেন?—বলিয়া হাঁক মারিয়া উঠিল, কালী—কালী! আবার পাত্রে পাত্রে কারণ ভরিয়া উঠিল।

বাবা।—শিষ্যের বৃদ্ধা মাতা আসিয়া বলিলেন. বাবা এই সব মোকদ্দমা-ফৌজদারির চেয়ে আপনারা দুই গুরুতে বিচার ক'রে যদি মিটমাট ক'রে দেন, সেই তো ভাল হয়। আপনারা দুজনে পরমাত্মীয়—

কালীচরণ বিপুল বিক্রমে হাঁক মারিয়া উঠিল, কালী—কালী। ও কথা ব'ল না আমাকে, ওটা হ'ল ভণ্ড, ওটা একটা পাঁঠা। মা, কালীর দরবারে ওকে বলি দিলে তবে আমার রাগ যায়।

পরদিনই জোড়া পাঁঠা বলি দিয়া পূজান্তে কালীচরণ সশিষ্য সদরে রওনা হইল মামলার জবাবের চেষ্টায়।

সাব্‌মেরিন ভর ভর করিয়া ডুবিল।

বাক্যালাপ তো নাই-ই, কেহ যে কাহারও মুখ পর্য্যন্ত দেখে না ইহার মধ্যে এতটুকু ছলনা নাই; কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ইহার কারণ স্মরণ করিয়া কালীচরণ দাঁত-কড়মড় করিয়া ওঠে বন্য বাঘের মত; রাধাচরণ সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আক্রোশে মুখ চোখ তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিতে থাকে দংশনোদ্যত কেউটের মত।

জীবনে প্রথম দেখা হইতেই ইহার সূত্রপাত।

রত্নপুরের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত টোলে একই বৎসরে দুই রত্নের আগমন হইয়াছিল। রত্নপুর গ্রামখানি কালীচরণ ও রাধাচরণ উভয়ের

গ্রামের প্রায় মাঝখানে পড়ে। গ্রাম্য পাঠশালায় উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করিয়া দুইজনেই আসিয়া টোলে ভর্ত্তি হইল। মহাপুরুষদের চিন্তাধারা প্রায় এক রকম, এবং কর্ম্মধারাও সেই সঙ্গে সঙ্গে এক রকমই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। উভয়েই মনস্বী, উচ্চ-প্রাথমিক পাস করিতে না করিতেই কালীচরণের দাড়ি বেশ ইঞ্চি-খানেক লম্বা হইয়া গজাইয়া উঠিয়াছে, এবং রাধাচরণের মুখমণ্ডলেও তখন সপ্তাহে দুইবার ক্ষুর চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কামানো মুখে কালসিটের দাগের মত আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কালীচরণ কয়দিন আগে আসিয়াছিল। কিন্তু রাধাচরণ যখন আসিল, তখন সে উপস্থিত ছিল না, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাতেই স্থানীয় এক শিষ্যের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে গিয়াছিল। বেলা প্রায় দু'পহরের সময় ঘর্ম্মাক্ত দেহে পাঁঠার একটি ঠ্যাং হাতে করিয়া টোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠ্যাংটা ধপ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া রাধাচরণের পাশের বিছানাতেই বসিয়া পড়িল। রাধাচরণ সবে তখন স্নানান্তে তিলক কাটিয়া মায়ের দেওয়া মালপোর ভাঁড় হইতে খান দুয়েক মালপো লইয়া জলযোগের উদ্যোগ করিতেছিল। সে ঘৃণায় শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, রাধে রাধে!

কালীচরণ খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল, এ বোরেগী কোত্থেকে এল রে!

রাধাচরণ চোখ পাকাইয়া বলিল, খবরদার!

খবরদার! কালীচরণ দুই হাত মাটিতে পাড়িয়া চতুষ্পদের মত ভঙ্গিতে রাধাচরণের মুখের কাছে আসিয়া প্রকাণ্ড এক হাঁ করিয়া বলিল, খেয়ে ফেলব তোকে।

"......খেয়ে ফেলবো তোকে।"

রাধাচরণ অহিংস হইলেও ভয় পাইবার পাত্র নয়; সে চট করিয়া সেই পাঁঠার কাঁচা ঠ্যাংটা তুলিয়া লইয়া সজোরে কালীচরণের হাঁয়ের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, নে, খা।

হাঁ কালীচরণের প্রকাণ্ড, কিন্তু পাঁঠার ঠ্যাংটার গোড়ার দিকটা তার চেয়েও প্রকাণ্ড ছিল, সজোরে গুঁজিয়া দিতেই কালীচরণ ঘায়েল হইয়া

পড়িল। রুদ্ধমুখে দুর্দান্ত পশুর মত আঁ-আঁ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ব্যাপারটা আরও অনেক দূর অগ্রসর হইত; কিন্তু কালীচরণের বিকট আঁ-আঁ শব্দ শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া পড়িলেন, কাজেই দুইজনেরই নিরস্ত না হইয়া উপায় রহিল না। সমস্ত শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় দুইজনকে সরাইয়া দুই ঘরে পৃথক বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মজা এমনই যে, সঙ্গে সঙ্গেই দুই ঘরেরই কয়েকটি ছাত্র আপনা হইতেই ঘর বদল করিয়া ফেলিল। শাক্ত যাহারা ছিল, তাহারা চলিয়া আসিল কালীচরণের ঘরে; বৈষ্ণবেরা আসিয়া রাধাচরণের ঘরে আখড়া জমাইয়া তুলিল।

অপরাহ্নে এ ঘরে সমবেতভাবে মালপো ভক্ষণ চলিতে আরম্ভ করিল, ও ঘরে কড়মড়-শব্দে মাংসের হাড় চূর্ণ হইতে লাগিল।

কিন্তু একদা দুইজনের এই বিবাদ সাময়িকভাবে মিটিয়া গেল। সেদিন রত্নপুরের বাবুদের বাড়িতে বিপুল উৎসব। একসঙ্গে দুই গৃহ দেবতার পূজা—কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমীতে একদিকে গোবিন্দজীর গোষ্ঠাষ্টমী, অন্যদিকে শুক্লানবমীতে জগদ্ধাত্রীপূজা। অষ্টমী এবং নবমীর পূজা সে-বার একদিনেই পড়িয়াছিল। সন্ধ্যায় কালীচরণ প্রায় একটা গামলা পরিপূর্ণ রান্না মাংস আনিয়া বন্ধুদের বলিল, কেইসা সাঁটিয়েছি দেখ। নে, খা, যে যত পারিস খা। দেখুক শালারা চেয়ে চেয়ে।—বলিয়া বৈষ্ণব প্রতি-পক্ষীয়দের ঘরের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

ও ঘরে খিল খিল করিয়া হাসির একটা রোল উঠিয়া গেল। শাক্ত ঘরেরই একটি ছেলে বলিল, ওরাও মালপো এনেছে, তাই হাসছে, পণ-খানেক।

কালীচরণ খানিকটা গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

ও ঘরের আর কথাবার্তার সাড়া না পাইয়া এদিকে রাধাচরণ একজনকে বলিল, চুপি চুপি দেখে আয় তো, কি করছে ওরা।

সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ওরা মদ আনবে, কালীচরণ আনতে গেল। খুব ফুর্ত্তি করবে আজ।

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে রাধাচরণ বলি, হুঁ। আচ্ছা, আমরাও গাঁজা আনব। খাসনি এখন মালপো, গাঁজা খেয়ে তারপর। চললাম আমি।

একজন বলিল, এই রাত্রে তুমি গাঁজা পাবে কোথা?

তাহাকে ভ্যাঙাইয়া রাধাচরণ বলিল, রাজারা মানিক পায় কোথা?—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

ওদিকে বাবুদের নাটমন্দিরে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, কন্‌সার্ট বাজিতে শুরু করিয়াছে। ছেলেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল, একজন বলিল, ঘরে ব'সে থেকে কি করবি? চল, রাধাচরণ আসতে আসতে যাত্রা শুনে আসি।

অমত কাহারও ছিল না, তবুও একজন বলিল, রাধাচরণ এলে কি হবে? দরজায় তো তালা দিতে হবে!

চাবি রেখে যাব সেইখানটিতে।

সেইখানটিতে চাবি রাখিয়া সকলে বাহির হইয়া গেল।

রাধাচরণ ফিরিয়া দেখিল, দুই ঘরের দরজাতেই তালা ঝুলিতেছে। চাবির জন্য সেইখানটিতে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার একটা সঙ্কল্প মনে জাগিয়া উঠিল, উহাদের ঘরের চাবিও তো ওই ঘরের মাথাতেই আছে, ঘর খুলিয়া গামলাটা উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিলে কি হয়! গাঁজা একটান টানিয়াই সে আসিয়াছিল, দ্বিধা বিশেষ হইল না তাহার। খানিকটা খুঁজিয়াই সে চাবি বাহির করিয়া ফেলিল। ঘর খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া গন্ধে গন্ধে ঠিক গামলার কাছে হাজির হইল। বড় চমৎকার গন্ধ উঠিয়াছে কিন্তু! গামলার কিনারায়

হাত দিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর এক টুকরা মাংস তুলিয়া মুখে দিল। আবার এক টুকরা, সে টুকরাটা বড়, তাহার পর গব গব করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বাধা পড়িল। তাহাদের ঘরে বোধ হয় ছেলেরা ফিরিয়াছে, শব্দ উঠিতেছে। হাতটা ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা গন্ধ পাইলে সর্ব্বনাশ হইবে। দ্রুত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সম্মুখেই লোক, সে আঁতকাইয়া বলিয়া উঠিল, কে?

সে লোকটিও আঁতকাইয়া উঠিল, কে?

রাধাচরণ দেখিল কালীচরণ, কালীচরণ দেখিল রাধাচরণ।

রাধাচরণের হাতে মাংসের টুকরা, কালীচরণের হাতে মালপো। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে উভয়েই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর মাংসের গামলা, বোতল, গাঁজার কল্কে, মালপো লইয়া দুইজনেই বাহির হইয়া গেল। উভয়েই বলিল, মরুক বেটারা। অর্থাৎ উভয়েরই সহচরবৃন্দ।

রাধাচরণ বলিল, আমাদের বাড়ি চল না, কি রকম মালপো খাওয়াই একবার দেখবে।

কালীচরণ বলিল, মাংস খেতে কিন্তু আমাদের বাড়িও যেতে হবে।

নিশ্চয়। কিন্তু মাংস খাই—একথা বলতে পাবে না কারুর কাছে।

কালী, কালী! তাই পারি? মালপোভোগ খাওয়ার কথা কিন্তু তোমাকেও গোপন রাখতে হবে।

রাধাচরণ বলিল, ওহে, রাধাকৃষ্ণের পীরিতি পর্য্যন্ত গোপনে, সে ভাবনা আমাদের বাড়িতে নেই।

কালীচরণই প্রথম রাধাচরণের বাড়ি গেল। কারণ পাঁঠাবলি দিতে পর্ব্বের প্রয়োজন হয়, মালপো কিন্তু পর্ব্ব না হইলেও চলে। রাধাচরণের বাপ-মা খুব খুশি হইয়া উঠিল, শাক্তের ছেলে বিশেষ করিয়া এই শাক্ত

চাটুজ্জে-বংশের ছেলেটিকে মালপোর প্রসাদে মালা ধরাইতে পারিলে সাক্ষাৎ গোবিন্দকে খুশি হইতে হইবে।

রাধাচরণের মা কন্যা ললিতাকে লইয়া ক্ষীরের মালপো তৈয়ারি শুরু করিয়া দিল। কালীচরণ মালপো মুখে দিয়া বলিল, চমৎকার!

রাধাচরণের মা বলিল, আর দুই খানা এনে দিক।

না না—বলিয়া কালীচরণ মৃদু আপত্তি তুলিলেও মা শুনিল না, ললিতাকে ডাকিয়া বলিল, ললিতে, আর দুখানা নিয়ে আয় তো।

ললিতার কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। মা বিরক্ত হইয়া বলিল, চোদ্দ বছরের ধাড়ী হারামজাদী নাচতে নাচতে পালাল কোথাও বুঝি! ও ললিতে! এবার সে নিজেই উঠিল। ললিতা উনানশালেই বসিয়া ছিল, মা বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, সাড়া দিস নি যে?

বিরক্তভরে ললিতা বলিল, আমি যদি না পারি?

কেন, পারবি না কেন শুনি?

না, ওই হুঁদো-মুষলো অসভ্যর সামনে যাব না।

যেতেই হবে তোকে, চল বলছি।

রাগে লজ্জায় রাঙা হইয়া ললিতা মালপো লইয়া কালীচরণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কালীচরণ হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, আমার বোনের সঙ্গে তোমার সই পাতিয়ে দোব ললিতে। সে কিন্তু ভারি কথা বলে, তোমার মত লাজুক নয়। ভারি পাজী সে। এই লজ্জাই আমি পছন্দ করি, বুঝলেন মা!

রাধাচরণ সেটা নিজেই প্রত্যক্ষ করিল।

কালীচরণের বাড়িতে রাধাচরণ বসিয়াছিল। কালীচরণ আদার সন্ধানে বাহিরে গিয়াছে, কালীচরণের মা ও বোন শ্যামা রান্না করিতেছিল। শ্যামা রাধাচরণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঝাল কেমন দোব বল!

রাধাচরণ বলিল, তোমার ঝাঁঝ যতখানি, ততখানিই দাও।

শ্যামা বলিয়া উঠিল, ও মা।—বলিয়া সে গালে হাত দিল।

মা বলিলেন, কি হ'ল ?

ওই বেড়ালটা।—বলিয়া হাতার বাঁটের সুচালো দিকটা উচাইয়া বলিল, দোব চোখ খুঁচে, এমন ক'রে দৃষ্টি দিবি তো।

রাধাচরণ হাসিয়া বলিল, যে দুর্নাম করলে তোমার দাদা আমার কাছে, বলে—ভারি কথা কয়, ভয়ানক মুখরা। আমি বলি, মুখরা আমার ভারি ভাল লাগে !

ইহার পর বন্ধুত্বটা গাঢ় হইয়া উঠিল। যাওয়া আসা চলিতেই ছিল। কিন্তু পরস্পরের বাপ-মায়ের অগোচরে। তাহারা প্রত্যেক পক্ষই ভাবিত, উহাদের জাতি মারিলাম বুঝি। কিন্তু সহসা ব্যাপারটা ফাঁস হইয়া গেল। উভয় পক্ষ হইতেই ছেলেকে কড়া শাসন করিয়া দিল।

সেবার কিসের একটা ছুটিতে কিন্তু লুকাইয়া রাধাচরণ কালীচরণের বাড়ি আসিয়া হাজির হইল।

কালীর মা খুশি হইয়া বলিল, এস বাবা, এস। কিন্তু কালী তো মামার বাড়ি গিয়েছে।

রাধাচরণ বিব্রত হইয়া বলিল, তাই তো !

শ্যামা বলিল, কিসের তাই তো ? কেন, আমরা কি কেউ নই নাকি ?

রাধাচরণ তবু বলিল, না না, মানে—

মা বলিল, তা শ্যামা তো ঠিকই বলেছে বাবা, নাই বা থাকল কালী, ঘরে আমরা তো রয়েছি।

রাধাচরণ সবিনয়ে একটু হাসিল। শ্যামা বলিল, এত মান হয় তো বাড়ি যাও।

রাধাচরণ ফিক করিয়া হাসিল। শ্যামার মা বলিল, তোর ভারি মুখ কিন্তু শ্যামা।

শ্যামাও এবার ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, মুখরাই রাধুদার ভাল লাগে মা।

কয়দিনের পর দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে শ্যামার মায়ের মনে এই কথাটা হঠাৎ অন্য আকারে মনে পড়িয়া গেল, রাধাচরণের সহিত শ্যামার বিবাহ দিলে কেমন হয়? এক আপত্তি, উহারা বৈষ্ণব, তাহাতে কি, ও তো মাছ মাংস ধরিয়াছে। এইবার শ্যামার হাত দিয়া গলায় একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দিলেই তো হইয়া গেল, কন্যাদায় হইতে বিনা পয়সায় উদ্ধার পাওয়া যাইবে। কথাটা আজই স্বামীকে বলিতে হইবে। আর শ্যামাকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার, যে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া কথা বলে সে। মা উঠিয়া শ্যামার ঘরে আসিয়া দেখেন, শ্যামা নাই। কোথায় গেল? সহসা চাপা গলায় খিল খিল হাসি যেন ভাসিয়া আসিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া শিষ্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের দুয়ারে আসিয়া সে দাঁড়াইল। হ্যাঁ, এই ঘরেই। দরজার একটা ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া দেখিয়া কালীর মায়ের মুখে আর বাক সরিল না।

শ্যামা তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছে, আর রাধাচরণ পায়ের কাছে বসিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছে, প্রিয়ে চারুশীলে! প্রিয়ে শ্যা-মা আমার, চারুশীলে!

সন্তর্পণে পলাইতে পলাইতে মা আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ক্রোধে আপন কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, এই নে, এই নে, এই নে।

রাধাচরণ চকিত হইয়া উঠিয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল, শ্যামার মা যাইতে যাইতে কপালে করাঘাত করিতেছে। সে আর দাঁড়াইল না, সটান

ওদিকের বাহিরে যাইবার দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আপন গ্রামের পথ ধরিল।

প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া সে সভয়ে দাঁড়াইয়া গেল। কালীচরণ আসিতেছে! সর্ব্বনাশ, দেখা হইলে সে তো ছাড়িবে না! ফিরিতে বাধ্য করিবে! সে ছাতাটা আড়াল দিয়া সন্তর্পণে চলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে ছাতার ফাঁক দিয়া দেখিল, কালী হন হন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম দিকে রৌদ্রে পুড়িয়া সে ছাতাটা পূর্ব্ব দিকে ধরিয়া চলিয়াছে কেন? যাহা হউক, নিজে বাঁচিলে বাপের নাম বজায় থাকিবে। পুড়ুক কালীচরণ, রৌদ্রে কেন, আগুনে পুড়ুক।

বাড়ি আসিতেই সে দেখিল, তাহার বাপ বাঁশী ছাড়িয়া অসি ধরিয়াছে। বলে, তোকে তো কাটবই, তারপর কাটব ওই কেলেকে।

ললিতার দেখা পাওয়া গেল না, মা ভাম হইয়া বসিয়া ছিল।

সে চলিয়া গেলে কালী আসিয়াছিল। তারপর ঘরে অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তির আবির্ভাব মা দেখিয়াছে। ললিতা অন্নপূর্ণা, আর কালীচরণ শিব সাজিয়া বলে কিনা, একটি চুম্বন ভিক্ষা দাও।

বাবা আর একবার গাঁজা টানিয়া বলিল, অন্নপূর্ণা, শিব! আমার ধর্ম্ম সুদ্ধু জলে গেল!

রাধাচরণও আগুন হইয়া উঠিল।

ওদিকে কালীচরণ তখন খাঁড়াখানা লইয়া আপন বাড়িতে ঘুরাইতেছিল।

ইহার পর ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। দুইজনে দুইজনের ভগ্নীপতি হওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না, হইলও তাই; কিন্তু আপনআপন ভগ্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের

তুষের আগুন উভয়েরই মনে ধিক ধিক জ্বলিতেছে। আজও তা নেবে নাই। বিশ্বাসঘাতক!

সহসা রাধাচরণ সংবাদ পাইল, তাহার শিষ্যের অবস্থা অন্তিমে উপনীত হইয়াছে। একরূপে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সে আসিয়া শিষ্যের শিয়রে উপস্থিত হইল।

ব্যাপার সাংঘাতিক। বিপরীতধর্ম্মী দুই সরিকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়িয়া উভয় উভয়কে ঘায়েল করিয়াছে। ও-বাড়ির কর্ত্তাও মর-মর হইয়া রহিয়াছে। ইনি খাইয়াছিলেন গাঁজা, উনি খাইয়াছিলেন মদ। প্রথম কলহ বাধে গুরু লইয়া; তাহার পর ধর্ম্ম; তাহার পর ইষ্ট; অবশেষে দুইজনকে দুইজনে গালি দিল, পরে চড়-চাপড় কিল-ঘুষি, শেষে লাঠি ও তলোয়ার। লাঠির আঘাতে শাক্তের মাথা দুখানা হইয়া গিয়াছে, বৈষ্ণবের পেটে তলোয়ারখানা আমূল ঢুকিয়া গিয়াছে।

শিষ্য গুরুকে দেখিয়া এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রশান্ত হাসি হাসিল, বলিল, শান্তিতে মরতে পারব এইবার। মনে মনে আপনাকেই স্মরণ করছিলাম।

রাধাচরণের আজ দুঃখ হইল। সে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। শিষ্য আবার বলিল, আমার সম্পত্তি আর কিছুই নেই। গোবিন্দজীকে আপনাকে দিলাম। ওঁকে আপনি নিয়ে যাবেন আপনার ঘরে। যা হয় সেবা করবেন। ওঁর গায়ের অলঙ্কার—সেও আপনি নিয়ে যাবেন। আপনার হাতে ভার দিয়ে আমি এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব। এই জন্যেই বোধ হয় আমার মৃত্যু হচ্ছিল না।—অকৃত্রিম বিশ্বাসের সুর তাহার কথাগুলির মধ্যে যেন রন রন করিয়া বাজিতেছিল।

কথাটা বোধ হয় সত্য; পরদিন ভোরেই সে মারা গেল। তাহার

আগের সন্ধ্যাতেই মারা গিয়াছে ও-বাড়ির কর্ত্তা। রাধাচরণের চোখ দিয়াও জল গড়াইয়া পড়িল।

রাধাচরণ দুঃখ অপনোদনের জন্য একটান গাঁজা টানিয়া রাধাগোবিন্দ-কে বেশ করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কাঁধে করিয়া রওনা হইল। ছোট মূর্ত্তি, কিন্তু ভারী অনেক।

ক্রোশ খানেক আসিয়া হাঁপাইয়া পড়িল। একটা গাছের তলায় বসিয়া বলিল, আঃ।

একটু দূরেই ঐ গাছটার তলায় কে বসিয়া? কালীচরণ? হাঁ, কালীচরণই বসিয়া রহিয়াছে। রাধাচরণের বড় রাগ হইল, সে উঠিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া বলিল, কি হ'ল বল তো?

কালীচরণ তাহার মুখের দিকে খানিক কটমট করিয়া চাহিয়া হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ হ'ল, ভালই হ'ল। মামলা করলে ওরা, আমাদের এল টাকা-পয়সা।

রাধাচরণও এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, তা যা বলেছ। আমাদেরও ঝগড়া মিটে গেল।

কালীচরণ শাসাইয়া উঠিল, খবরদার! কেউ যেন এ কথা না জানতে পারে। তুই লাগাবি, আমি ফাঁসাব।

ঘাড় নাড়িয়া সমঝদারের মত রাধাচরণ বলিল, ঠিক বলেছ। তুমি লাগাবে, আমি ফ'াসাব।

কিছুক্ষণ পর কালীচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, লোক দুটো কিন্তু না ম'লেই বেশ হ'ত।

রাধাচরণ একটু ভাবিয়া পরম তত্ত্বজ্ঞের মতই বলিল, আমরা কে,

ভগবান মেরেছে, আমরা কি করব? তারপর, ওরা তোমাকে গয়না সমেত ঠাকুর দেয় নি?

দিয়েছে। কিন্তু বিষম ভারী।

এক কাজ কর।

কি?—প্রশ্ন করিয়াই কালীচরণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, গয়নাগুলো খুলে নিয়ে—

রাধাচরণ বলিল, হ্যাঁ। কাছেই নদী, দহের জলে—

মাছের কাঁটা

অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নারী!

তাহারা না পারে কি? তাহারা অমাবস্যাকে পূর্ণিমা করিতে পারে, পূর্ণিমাকে অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকিয়া দিতে পারে, দিনকে রাত্রিতে পরিণত করিতেও তাহারা সক্ষম। তাহাদের চক্রান্তে না হয় কি? নতুবা হরি-হরের মত দুই ভাই, নামও হরিকুমার আর হরকুমার, তাহারা ভিন্ন হইবে কেন!

মূলে ওই নারী।

ছোট ভাই হরকুমারের বিবাহের দেড় বৎসরের মধ্যেই সামান্য কারণে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। ব্যাপারটা ঘটিল একটা মাছের মুড়া লইয়া। হরকুমারের মাছ ধরিবার বাতিক চিরদিনের। প্রত্যহ ছিপ ও চার লইয়া তাহার বাহির হইয়া যাওয়া চাই-ই। কিন্তু মাছ সে কখনও বড় পায় না। সেদিন হঠাৎ কোন্ ভাগ্যগুণে অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে, একটা সের চার পাঁচ ওজনের মাছ সে ধরিয়া ফেলিল। ছোটবৌ প্রত্যাশা করিয়াছিল, মাছের মাথাটা পড়িবে হরকুমারেরই পাতায়, এবং পাতিব্রত্যের দাবির জোরে স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট কাঁটাগুলি অন্তত সে চুষিতে পাইবে। কিন্তু বড়বৌ মাথাটা দিল হরিকুমারের পাতায়, আর ল্যাজাটা দিল হরকুমারকে, বলিল, তোমায় ফেঁচাটা দিলাম ঠাকুরপো, আমার 'পেছা পেছা' বেড়াতে হবে কিন্তু। হরকুমার বলিল, আর দাদাকে মুড়ো দিলে, দাদার চুড়োটা বুঝি তোমার পায়ে খসে পড়বে?

বড়বৌ বলিল, আবার হুড়ো খেতেও হতে পারে ভাই। যে বচন তোমার দাদাটির! এক একটি কথা এক একটি হুল।

হরিকুমার মাছের মাথাটা ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, আর তোমার? তোমার যে একেবারে সাক্ষাৎ শূল, আমূল বুকে গিয়ে বেঁধে!

হরকুমার হাসিয়া বলিল, এই আরম্ভ হল! কুঁতুলে লগ্নে তোমাদের শুভদৃষ্টি হয়েছিল বাপু!

বড়বৌ বলিয়া উঠিল, যা বলেছ ঠাকুরপো!

হরিকুমারও হাসিয়া বলিল, আমিও সেকথা এক এক সময় ভাবি, বুঝলি!

হরকুমার বলিল, ওঃ, আপনাদের দোষ লগ্নের ঘাড়ে চাপিয়ে দুজনে ভারি খুশি, না!

বড়বৌ এবং হরিকুমার উভয়েই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এমনি সুমধুর হাস্যরসের মধ্য দিয়া যে নাটিকার প্রথম দৃশ্যের পরিশেষ হইল, তাহার দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভ—হলাহলগন্ধী উগ্ররসের মধ্যে।

ঠিক ঘণ্টাখানেক পরেই। হরকুমার ও ছোটবৌ তখন আপনাদের শয়নকক্ষে। বড়বৌ নিজের কাজকর্ম্ম সারিয়া উপরে যাইতে যাইতে ছোট বৌয়ের শয়নকক্ষের দুয়ারে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। তারপর ফুঁ দিয়া হাতের আলোটা নিবাইয়া দিয়া বন্ধ দুয়ারের গায়ে সন্তর্পণে কান পাতিয়া রহিল।

হরকুমার তখন বলিতেছিল, আঃ, তাতে এমন আর কি হয়েছে। দাদা মাছ খেতে একটু ভালবাসে—

বাধা দিয়া ছোটবৌ বলিল, দাদা নয় গো—দাদা নয়—ভালবাসেন তোমার বৌদিদি। দেখলে না, কতটুকু খেলেন বটঠাকুর আর পাতে থাকল কতটা!—বলিয়া হাসিয়া বলিল, সেই তাঁতির ষোল কই মাছের ব্যাপার! এক তাঁতি ষোলটা কই মাছ ধরেছিল। তাঁতিবৌ কিন্তু খাবার

সময় তাঁতির পাতে দিলে একটা। তাঁতি বললে, একটা কেন? তাঁতিবৌ তখন হিসেব দিলে, দুটো পালিয়ে গেল, দুটো চিলে নিলে, এমনি ক'রে চোদ্দটার হিসেব দিয়ে শেষে বললে, 'আমি ভালমানুষের ঝি—তাই এত হিসেব দিই, তুই যদি হ'স ভালমানুষের পো, ন্যাজটা মুড়োটা খেয়ে মাঝখানটা খো।'—বলিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি কি ওকে কম ভাব নাকি? ওঁরা দুটিতেই কেউ কম নয়! এর মধ্যে দিদি বেশ টাকা করেছে হাতে আমি নিজে দেখেছি।

—তুই বা কম কিসে, ওলো ছোটবৌ? বলি, সমস্ত দুধের সরটুকু রোজ স্বামীর নাম ক'রে কে তুলে নিয়ে যায় লো? আর টাকা করেছে কে? বলি, রোজ দুপুরে আঁচল ভ'রে চালগুলো নিয়ে যায় কে শুনি?

বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে শুনিতে আর বড়বৌয়ের সহ্য হইল না, সে বেশ সরস শ্লেষতীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দিয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে স্বামীস্ত্রীতে চমকিয়া উঠিল—তবে হরকুমার বেশি আর ছোটবৌ কম—শুধু কমই নয়, মুহূর্ত্তে সে আত্মসম্বরণ করিয়া শঙ্কিতভাবে বলিল, এঃই—এঃই! নাঃ। ও ঘর হইতে হরিকুমারও বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বড়বৌ, বড়বৌ, আঃ কি বিপদ!

বড়বৌ তখন আবার আরম্ভ করিয়াছে, দুধের মেয়ে তুই, তোর বিয়ে দিয়ে আনলাম আমি, আর তুই—

হরিকুমার বলিল, আঃ, থাম না বড়বৌ! হ'ল কি?

—হ'ল কি? আমি মাছের মুড়োটা তোমার পাতে দিয়েছি—নিজে খাবার জন্যে! আমি সংসার থেকে পয়সা করেছি! আর তুমিও নাকি কম নয় গো!

—আমি!—সবিস্ময়ে হরিকুমার বলিয়া উঠিল।

বড়বৌ আবার আরম্ভ করিয়া দিল, ও মানুষটা যদি কম না হ'ত তবে এখন এক হাতে খাচ্ছিস, তখন দু হাতে খেতিস, বুঝলি! থাকত সম্পত্তি! ফুঁয়ে উড়ে যেত, বুঝলি ফুঁয়ে উড়ে যেত। এই তো বিয়ের পরে দেড়শো টাকা চুরি ক'রে তোর স্বামী যে কলকাতা গেলেন ফুর্ত্তি করতে। হরিকুমার আবার বলিল, আঃ বড়বৌ!

বড়বৌ এবার হয়তো নিবৃত্ত হইয়া চলিয়াই আসিত—তাহার গায়ের জ্বালা অনেকখানি মিটিয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ঘরের ভিতর হইতে মৃদু অথচ ধাতব ঝঙ্কারের মত কণ্ঠস্বরে উত্তর আসিল, বেশ তো, সে টাকাটা ইনি একলাই দেবেন। কিন্তু তিনটে ছেলের খরচ, এক ছেলের পড়ার খরচ—সেটাও তো মনে রাখতে হয়।

এবার শুধু বড়বৌ নয়—হরিকুমারও স্তম্ভিত হইয়া গেল। মিনিট-খানেক পরেই হরিকুমার চীৎকার করিয়া উঠিল, মুখ সামলে কথা বলবে তুমি, ছোটবৌমা! পাজি ছোট লোক বংশের মেয়ে কোথাকার!

দরজা খুলিয়া হরকুমার বাহির হইয়া বলিল, যাও যাও, ঘরে যাও, রাত্রে চীৎকার—

অসহিষ্ণু হরিকুমার ঘৃণাভরে বলিল, স্ত্রৈণ কোথাকার!

—আমি স্ত্রৈণ?

—আলবৎ—একশো বার; স্ত্রীর হ'য়ে ঝগড়া করতে এসেছিস!

—আর তুমি? তুমি স্ত্রৈণ নও; তুমি স্ত্রীর হ'য়ে ঝগড়া করছ না?

—ওরে বাঁদর, নিজের স্ত্রীর কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিস না?

—তোমার স্ত্রীর কথাগুলো শুনতে পেলে না?

—কি বললি, শূয়োর? চড় মেরে তোকে আমি সোজা করে দেব, জানিস?

—যাও যাও, ঢের চড় মারনেওয়ালা দেখেছি।

—খবরদার, মুখ সামলে কথা বলিস।

—কিসের মুখ সামাল, কিসের খবরদার! কারু খাই, না পরি আমি যে, মুখ সামলে থাকব? তুমিও তোমার বাপের খাও, আমিও আমার বাপের খাই।

—ওরে আমার বাপের বেটা রে!—বলিয়া এবার হরিকুমার হাত পা নাড়িয়া একটা বীভৎস ভঙ্গি করিয়া উঠিল। ওদিকে দুই বৌয়ের বাক্যবাণ বর্ষণের বিরাম ছিল না। এ যে বাণটি নিক্ষেপ করে, ও সে বাণটি কাটিয়া আর একটি নিক্ষেপ করে।

বড়বৌ বলিতেছিল, থাক থাক, আর ধর্ম্ম দেখাসনে। নিজে ধর্ম্মকে দেখ। বলে যে সেই, 'চুপ করে থাক থ্যাবড়ানাকী ধর্ম্মে রাখে তোরে' —বুঝলি?

ছোটবৌয়ের নাকটি থ্যাঁদা—'থ্যাবড়ানাকী' কথাটা তাহাকে বড়ই বাজিল। সে উত্তর দিল, ধর্ম্মকে দেখব কি করে বল, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম যে আমার ভাসুর, আমার যে ঘোমটা দিতে হয় তাকে দেখে! আবার ধর্ম্মের ন্যাড়া-তালগাছে তার বাসা, আড়চোখেও যে তাকিয়ে দেখব তার উপায় নেই।

বড়বৌ শীর্ণাকৃতি লম্বা, তার উপর চুলের পরিমাণও কম, তাই ন্যাড়াতালগাছের জবাবে 'থ্যাবড়ানাকী'র শোধ ছোটবৌ লইল।

এদিকে তখন হরিকুমার বাহির করিয়াছে ছাতা; হরকুমার কোন অস্ত্র না পাইয়া ঘরের দেওয়ালে বসানো আলনাটাকেই টানিয়া লইয়া পাঁয়তারা ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ও হোই! পাড়ার চৌকিদার রোঁদ দিতে আসিয়া গোলমাল শুনিয়া ডাকিতেছে, চাটুজ্জে মশাই!

বড়বৌয়ের এতক্ষণে খেয়াল হইল। সে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া

বলিল, চল চল, কাল যা হয় বিহিত করবে। আজ রাত অনেক হ'ল।

হরকুমার স্ত্রীকে বলিল, কালই ভিন্ন হবো। চল—চৌকিদারে হাঁক দিচ্ছে।

ধর্ম্মযুদ্ধ উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে রাত্রিটার মত স্থগিত রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্যই নয়—প্রথম অঙ্কেরও এইখানে শেষ।

কুক্ষণেই হরকুমার মাছটা পাইয়াছিল। মাছের কাঁটা সংসারের গলায় এমন ভাবে বিঁধিল যে, অস্ত্রোপচার ভিন্ন আর উপায় রহিল না। বিধাতা ডাক্তার আসিয়া ভাগ্যচক্র দিয়া সংসারের গলাটি কাটিয়া দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, বিধাতার অপারেশন ঠিক হয় নাই, কাঁটাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দ্বিধাবিভক্ত সংসার রাহু ও কেতুর মত হরিকুমার ও হরকুমারকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল। বলিতে ভুলিয়াছি, সমস্ত চুল-চেরা ভাগ হইয়া গেল। একটা পাশবালিশ বাড়তি হইল, হরিকুমার বলিল, ওটা আমারই থাক। দাম যা হয় দোব। হরকুমার বলিল, না ওটা কেটে তুলো ভাগ হোক। আমারও বালিশ করাতে হবে। তুলো কিনতে হবে।

হরিকুমার আছাড় মারিয়া বালিশটা ফাটাইয়া দিয়া ঘরময় তুলা উড়াইয়া দিয়া ছাড়িল।

এমনই অনেককিছু ঘটিল, কিন্তু সে সমস্ত যবনিকার অন্তরালেই থাক।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের প্রারম্ভেই দেখা যায়—বাড়ির মধ্যে প্রাচীর উঠিয়াছে, আর সেই প্রাচীরের দুইদিকে দুই ভাই বাস করিতেছে।

সেদিন হরকুমারের ভাগের গাইটা নিঃসঙ্কোচে হরিকুমারের বাড়ি গিয়া উঠিল। বাড়ির ওই দিকটাতেই পূর্ব্বে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল

হরিকুমার তাহার বড় ছেলেকে দিয়া সেটাকে তৎক্ষণাৎ খোঁয়াড়ে পাঠাইয়া দিল।

দিনকয় পর, হরিকুমারের পেটরোগা শিশুপুত্রটার দুধের জন্য কেনা ছাগলটা দুইটা বাচ্চাসহ আসিয়া হরকুমারের বাড়িতে প্রবেশ করিল। হরকুমার লাফ দিয়া গিয়া দুয়ারটা বন্ধ করিয়া স্ত্রীকে বলিল, ধরতো পাঁঠার বাচ্চাটাকে।

স্ত্রী বলিল, সব কটাকে ধ'রে খোঁয়াড়ে দাও—একটা কেন? পাঁচ আনা পয়সা লেগেছে সেদিন। আজ ওদের লাগুক।

বিরক্ত হইয়া হরকুমার চাপা গলায় বলিল, আঃ যা বলছি তাই শোন, তিন পাঁচ পনের আনা উশুল করব আজ! ওটাকে—তারপর নীরব ইঙ্গিতে পাঁঠা কাটিয়া ব্যাপারটা স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিল, মশলা কম দিও, যেন গন্ধ না ওঠে—রান্নাঘরের দরজা এঁটে বন্ধ ক'রে দাও।

পরদিন সকালে বড়বৌ তারস্বরে ছোটবৌয়ের বাড়ির দিকে মুখ করিয়া গালি গালাজের মহা রণ জুড়িয়া দিল, অম্বলশূল হবে—পেটে জিভে পোকা পড়বে—ছাগলের মত ব্যা-ব্যা ক'রে মরবে, শেষকালে বাক্যি হরে যাবে।

ছোটবৌ ওধারে আরম্ভ করিল গরুর অভিসম্পাত—সংসার ছারখারে যাবে। বাছুরটার মত তোর ছেলেরা মায়ের অভাবে হাম্বা-হাম্বা করবে।

এমনি চলিতেই লাগিল।

সন্ধ্যায় সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ। হরিকুমারের আর সহ্য হইল না। তাহার জ্যেষ্ঠত্বের দাবি বরাবর আহত হইতেছিল। সে রুখিয়া আসিয়া হরকুমারের গালে ঠাস করিয়া একটি চড় বসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে হরকুমারের এক ধাক্কায় হরিকুমার হইল ধরাশায়ী। তারপর মল্লযুদ্ধ। পাড়া-পড়শিরা আসিয়া ছাড়াইয়া দিল।

হরিকুমার প্রচণ্ড রাগে দুঃখে চলিল—থানা।

ছোটবৌ হরকুমারকে ধমক দিয়া বলিল, আঁ্যা ন্যাকামি! তুমিও যাও না থানায়! ও যে গেল।

হরকুমারও ছুটিল।

বড়বৌ ও-পাশে তারস্বরে কাঁদিতেছিল, খুন করেছে গো! কি করব মা গো!

ছোটবৌ একলা বসিয়াই ছড়া কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিল—

মেয়ে বলেছেন, কি করব মা গো!
মা বলছেন, ভাত চারটি খা গো!

পরদিন দুই ভাই ছুটিল সদরে—দুইজনে দুই ফৌজদারি মামলা দায়ের করিয়া বাড়ি ফিরিল।

বিধাতা-চিকিৎসক ছায়াময় কায়া লইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দ্বিধাবিভক্ত সংসারটির দিকে চাহিয়া খুঁজিতেছিলেন—কোথায় মাছের কাঁটা!

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষে এইখানেই পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্যের পটোত্তোলনের পর দেখা যায়—মাস দুই আড়াই সময় চলিয়া গিয়াছে। জীবন-নাট্যের ঘাত-প্রতিঘাতের বাহ্যিক আক্ষেপ কিছু কমিয়া আসিয়াছে। বোধহয় দারুণ উত্তেজনার পর একটু অবসাদ আসিয়াছে। নদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু স্রোত কমে নাই; ভিতরের ঘূর্ণিও সমভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে। দুই ভাইয়ে এখন মুখ-দেখাদেখি নাই, কিন্তু দুই তিনটা মামলা কূট পরিচালনায় পরিচালিত হইতেছে।

হরকুমার বাড়ির আপন অর্দ্ধাংশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। হরিকুমার বাহিরে আসিল। হরকুমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বাড়ি ঢুকিল—অথবা

হরিকুমারের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। হরকুমারও অমনই দাঁত কিষ-কিষ করিয়া হইল বিপরীতমুখী। ব্যাপারটা শুনিতে হাস্যকর এবং অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়—কিন্তু এই বাস্তব। বর্ত্তমানে সুন্দ-উপসুন্দ—বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ ঠিক এইভাবেই ঘটিয়া থাকে। যাক।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই। হরকুমার বাড়ীর দরজায় উত্তর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কারণ ও-পাশে আপনার দাওয়ায় তক্তা-পোশের উপর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া হরিকুমার বসিয়া আছে।

এমন সময় একটি ভদ্রলোক বাইসিক্লে করিয়া আসিয়া হরকুমারকে দেখিয়াই নামিয়া বলিলেন, এই যে, নমস্কার!

হরকুমারও নমস্কার করিয়া বলিল, নমস্কার! তারপর, কি রকম? ও—! বলিয়াই সে ফিক করিয়া হাসিল।

ভদ্রলোকও হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছেনই তো! এখন আপনাদের এখানেই—কই, আপনার দাদা কই? —ও—ওই যে! বলিতে বলিতেই তিনি অগ্রসর হইয়া হরিকুমারের ওখানে গিয়া উঠিলেন।

—নমস্কার হরিকুমারবাবু। তারপর এবার একবার লেগে পড়ুন। এখানে হিতলালবাবুর আপনিই ভরসা।

ব্যাপার হইতেছে ভোট-যুদ্ধ। অ্যাসেম্ব্লি-ইলেকশনে হিতলালবাবু দাঁড়াইয়াছেন—তাঁহার পক্ষে ভোট সংগ্রহ করিতে হইবে। হিতলালবাবু গত কয়েক বৎসর যাবতই এম-এল-সি-আছেন—আবারও যাইবেন এই একান্ত অভিপ্রায়। হরিকুমার-হরকুমার দুই ভাই-ই গত দুইবার ইলেকশনে হিতলালবাবুকে সাহায্য করিয়াছে। হরিকুমার বলিতে কহিতেও পারে —আর এসব বিষয়ে তাহার যেন কিছু ক্ষমতাও আছে। হরকুমার বক্তৃতা অবশ্য কখনও করে নাই—তবে দাদার সহকারী হিসাবে খাটিয়াছে অনেক। এবার হিতলালবাবু একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। দুই দুই জন

প্রার্থী তাঁহার বিপক্ষে। যুদ্ধ নাকি এবার ত্রিভুজাকার। একদিকে কংগ্রেস —অপরদিকে হিন্দু-সভার সভ্যরূপে স্থানীয় জমিদারদের বেয়াই।

হরিকুমার কহিল, তা বেশ। কিন্তু বুঝছেন তো—মানে—এবার আর—

হিতলালবাবু লোকটি বিচক্ষণ ব্যক্তি, হরিকুমার মানেটা বলিতে গিয়া থামিয়া যাইতেই তিনি মানেটা বুঝিয়া লইলেন এবং বলিলেন, নাঃ এবার আর টাকা-কড়ির গোলমাল হবে না। বেতন এবার অগ্রিম। বলিয়াই তিনি দশ টাকার দুইখানি নোট বাহির করিলেন।

—আপনার কুড়ি আর আপনার ভায়ার পনের।

হরিকুমার বলিল, ভায়ার কথা আমি বলতে পারব না মশায়, সে তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।

ভায়া তখন তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকিয়া জামাটা টানিয়া লইয়া হন হন শব্দে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

স্ত্রী প্রশ্ন করিল, যাচ্ছ কোথায়?

—জমিদারের বাড়ি—বামুনগাঁ।

—কেন? হ'ল কি আবার?

—ভোট—ভোট।

—ভোট কি গো?

—ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ক'রে পেছু ডেক না, বাপু! সে আরও কি যে বলিল, তাহা আর শোনা গেল না।

ঘণ্টা দুয়েক পরে সে ফিরিল। তখনই আপন দুয়ারে দাঁড়াইয়া হরিকুমারের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া সে চীৎকার আরম্ভ করিল, ভোট ফর হিন্দু-সভা—শ্রীযুত বাঁকাচাঁদ রায়। ডাউন—ডাউন উইথ হিতলাল —দেশদ্রোহী! ভ্রাতৃদ্রোহী!

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিধাতা-ডাক্তার হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। কাঁটাটা পাওয়া যাইতেছে না।

হরিকুমার দলে টানিল পাঠশালার পণ্ডিতকে। হিতলালবাবু জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, তিনি পাঠশালার সাহায্য বাড়াইয়া দিবেন, চেয়ার বেঞ্চের জন্য টাকা—তাও নাকি দিবেন। এক হাতের পাঁচটা আঙুল, পাঠশালার ছেলে অনেকগুলি, পণ্ডিতের সাহায্যে সে ছেলেদের কাজে লাগাইয়া দিল। ছুটি পাইয়া ছেলের দলও মহাখুশি—তাহারা কঞ্চির আগায় কাগজের পতাকা সাঁটিয়া—দল বাঁধিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল—জয় হিতলাল বাবুর জয়! জয়! জয়! জয়!

হরকুমার হটিবার পাত্র নয়—সে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থানীয় থিয়েটারের দলকে স্বপক্ষে টানিল।

হিন্দুসভার সভ্য বাঁকাচাঁদবাবু 'হিন্দুবীর'-অভিনয়ের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিবেন। থিয়েটারের দল গলায় হারমোনিয়ম ঝুলাইয়া ভোটকীর্ত্তনের দল বাহির করিল।—

'অগাধ জলে ডুবছে হিঁদু, ভোটের ভেলা দে রে ভাই!'

মধ্যে মধ্যে হরকুমার চীৎকার করিয়া ওঠে, ভোট ফর—

সকলে সমস্বরে বলে, বাঁকাচাঁদ রায়।

দেখা গেল, হরকুমারেরই বন্দোবস্ত ভাল—লোকে গান শুনিতে ভিড় করিয়া আসে—ছেলেদের 'হিতলালবাবুর জয়' চিৎকারে বিরক্ত হয়। কিন্তু হরকুমারের অসুবিধা ঘটায় ম্যালেরিয়ায়; মধ্যে মধ্যে তাহার কোঁ কোঁ করিয়া জ্বর আসে।

হরিকুমার অনেক চিন্তা করিয়া মীটিং আরম্ভ করিল। দেখিল সুবিধা অনেক—হিতলালবাবু নিজেকে প্রজার হিতৈষী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—দ্বিতীয়তঃ তিনি একবার কৃষক-আন্দোলনে প্রথম জীবনে

জেল খাটিয়াছেন নিজেও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। আর হরিকুমার নিজেও দু দশ কথা বলিতে পারে।

সে তোড়জোড় করিয়া মীটীং ডাকিয়া বসিল।

হরকুমার প্রমাদ গণিলেও দমিল না—সে স্থির করিল, সেও বক্তৃতা করিবে।

সভায় লোকজন মন্দ হয় নাই। হরিকুমার আরম্ভ করিল—

মহাশয়গণ, একবার সোনায় আর লোহার ঝগড়া আরম্ভ হয়েছিল। এ, বলে আমি বড়; ও বলে আমি বড়। শেষে স্থির হ'ল বেশ, লোকে কাকে আদর করে, দেখা যাক। ফ'লে সোনা একটা ফাল—মানে লাঙ্গলের ফাল হ'ল—আর লোহা একটা ফাল হয়ে পথে পড়ে থাকল। সকালবেলায় এক চাষী—যারা হ'ল দেশের প্রাণ—মনে রাখবেন, আপনারা হলেন দেশের প্রাণ, যাক, সেই চাষী পথে চলতে সেই ফাল দুখানাকে দেখলে; বলুন দেখি, কোনখানাকে সে নেবে?

হরকুমার ধাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল, দুখানাকেই।

হরিকুমার তাড়াতাড়ি বলিল, না, মনে করুন একখানাই পাবে, একখানা নিলে আর একখানা উড়ে যাবে। জমিদার হ'ল সোনা, ওই বাঁকাচাঁদ বাবু হ'ল জমিদারের বেয়াই, নিজে জমিদার। ওকে পাঠাবেন না, ভোট দেবেন না, বেড়ালকে মাছ বাছতে দেবেন না। সর্ব্বনাশ হবে—

হরকুমার আর থাকিতে পারিল না, হাঁ সর্ব্বনাশ হবে—হিন্দুর সর্ব্বনাশ হবে, যদি ওই দেশদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী হিতলালকে ভোট দেন, তবে হিন্দুর সর্ব্বনাশ হবে! হিন্দুর প্রতিনিধি বাঁকাচাঁদবাবু—

হরিকুমার বলিল, হিন্দু! হিন্দুর প্রতিনিধি! ওঃ, আচ্ছা মশাইগণ, এই হিন্দুর প্রতিনিধিটির টিকি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন তো তার লোকটিকে! হরকুমার বার দুই ঢোঁক গিলিয়া অবশেষে চট করিয়া

বলিল, টাক পড়ে টিকি উঠে গিয়েছে মশাই, নইলে ছিল—এতখানি!
হিতলাল বাবুকে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত।

এমন সময় কয়েকজন কংগ্রেস ভলেন্টিয়ার আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া বলিল, আগামী পরশু আপনাদের কাছে কংগ্রেসের বক্তব্য বলবার জন্যে দশের নেতা, দেশের সেবক শ্রীযুত দেশমান্য আসবেন। এখানে এক বিরাট সভা হবে। আপনাদের কাছে নিবেদন, এই দুই পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্রোহীর কথা শুনে যেন ভুলবেন না! বন্দে মাতরম্!

হরিকুমারের বালকসম্প্রদায় সঙ্গে সঙ্গে পরমোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্!

ছেলেদের পরই থিয়েটারের দেশ-প্রেমিক নায়কের দল, তারপরই জনতার বহু জন উত্তেজনার একটা হেতু পাইয়া চেঁচাইল, বন্দে মাতরম্!

ওদিকে বিধাতাপুরুষ সভয়ে ভাগ্যচক্রাদি যন্ত্রপাতি গুটাইতে আরম্ভ করিলেন। নাঃ, কাঁটাটা আর পাওয়া যাইবে না।

হরিকুমার বাড়িতে আসিয়া একখানা কম্বল টানিয়া লইয়া পাট করিতে করিতে বলিল, সভার মাঝে আমার মাথাটা কাটা গেল! বললে কিনা, পাষণ্ড, ভ্রাতৃদ্রোহী—আঙুল দেখিয়ে!

বড়বৌ বলিল, ছি ছি, তোমাদের গলায় দড়ি! বলি ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন তো সবাই হয়, এমন সভা ক'রে কে কেলেঙ্কারী করে?

হরিকুমারের রাগ হইয়া গেল; সে বলিল—মাছের মুড়োটা আমার পাতে দিয়েছিলে কেন? আর কিছু না বলিয়াই সে হন হন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সে চলিয়াছে সদরে, হিতলালবাবুর নিকট। কংগ্রেসের সভার দিন না হোক, অন্তত দুই একদিন পরেও তাহার এখানে একজন ভাল বক্তার প্রয়োজন।

পথে সাঁইথিয়া জংশনে আসিয়া কিন্তু তাহার আপসোসের আর সীমা রহিল না। সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই ; মোটরবাসগুলো সমস্ত নাকি ভোট-যুদ্ধের রথ হইয়া বাঁধা পথ পরিত্যাগ করিয়াছে। সমস্ত রাত্রি এখন এই দারুণ শীতে মুসাফিরখানায় পড়িয়া থাকিতে হইবে। চারিদিক খোলা টিনের চালাটায় যেন হিমানী-প্রবাহ বহিতেছে। বড়বৌয়ের উপর রাগ করিয়া শতরঞ্জি পর্য্যন্ত লইতে ভুলিয়া গিয়াছে। সে কম্বলখানা মুড়ি দিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু মাটি হইতে যে হিম উঠিতেছে!

—কে হে ভাই—কে হে? ও তোমারও দেখছি আমার মত অবস্থা, দোয়াত আছে, কালি নেই, কম্বল আছে, পাতবার কিছু নেই। আমার আবার পাতবার শতরঞ্জি আছে কম্বল নেই।

হরিকুমার আশ্চর্য্য হইয়া কম্বলের ঘোমটা খুলিতেই হরকুমার গটগট করিয়া চলিয়া গিয়া ও-পাশে শতরঞ্জিটাই গায়ে জড়াইয়া বসিয়া হুঁহুঁ করিয়া একটা গান ধরিয়া দিল। সেও সদরে বাঁকাচাঁদবাবুর কাছে চলিয়াছে বক্তার জন্য। তাহার উৎসাহ উৎকট। সে আবার বাড়ি পর্য্যন্ত যায় নাই, থিয়েটার ক্লাব হইতেই একখানা শতরঞ্জি টানিয়া লইয়া চলিয়া আসিয়াছে।

শেষ ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রির শীত, তাহার উপর বাতাস আসিতেছে—অদূরবর্ত্তী ময়ূরাক্ষী নদীর জলো বাতাস। হরিকুমার হি-হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দেখিল, হরকুমার শতরঞ্জি মুড়ি দিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁপিতেছে।

হঠাৎ হরিকুমারের হাসি আসিল। হরার ওই কুণ্ডলী পাকাইয়া শোয়ার অভ্যাস চিরকাল। বাল্যকালে এক লেপে শুইয়া হরার কত লাথিই সে খাইয়াছে!

হরকুমার ঘুমায় নাই, সে কাঁপিতে কাঁপিতেই উঠিয়া দাঁড়াইল। হরকুমারের মাথার উপরের আলোটার ছটায় হরিকুমার দেখিল, তাহার

মুখের চেহারা যেন কেমন অস্বাভাবিক। হরকুমার টলিতে টলিতে আসিয়া বলিল, দাদা, আমার বড় জ্বর এসেছে। হু-হু-হু-হু—বড় কাঁপুনি।

মুহূর্তে আপনার গায়ের কম্বলের আধখানা উন্মুক্ত করিয়া হরিকুমার বলিল, আয় আয়, ভেতরে আয়।

হরকুমার বলিল, শতরঞ্চিটা পেতে ফেলে দুজনে বসি, আর তোমার কম্বলটা দুজনে গায়ে দিই।

তারপর দাদার বুকের কাছে বসিয়া বলিল, জড়িয়ে ধর দাদা—বড্ড কাঁপুনি। হু-হু-হু—তোমার র‍্যাপারটা সুদ্ধু আমায় দাও!

হরকুমারকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে হরিকুমার বলিল, হুঃ—যত বিশ্রী কাণ্ড! মেয়েদের কথায়!

—মেয়েমানুষ হ'ল যত নষ্টের মূলে! কি কেলেঙ্কারিটা হ'ল বল তো?

—কাল সভাতে কি বললে বল্ তো! আঙুল দেখিয়ে—পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্রোহী! ছি-ছি-ছি!

—ছি-ছি না ছি-ছি, কালই চল সদরে মামলাগুলো তুলে নিই।

—নিশ্চয়! আর হিতলালবাবুর কাছেও জবাব দোব।

—অই তোমার পাগলামো! বড়লোকস্য ধনং হরে—রাজা বেশ্যা পার্শ্বচরে! কার ভোট হ'ল না হ'ল আমাদের ব'য়েই গেল। হৈ হৈ ক'রে দিয়ে যে কটা টাকা আমাদের পাওনা হয়, আমরা ছাড়ব কেন? ঝগড়াটা লোক-দেখানো দুদিন আরও থাক না।—বলিয়া সে জ্বর-গায়েই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে হরিকুমারও হাসিয়া উঠিল—হা-হা-হা-হা।

হাসির উচ্ছ্বাসটা থামিয়া কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই কিন্তু হরিকুমার গম্ভীর হইয়া উঠিল, হরকুমারকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াও সে চিন্তা করিতেছিল, তাই তো, বড়বৌ কি বলিবে? কাজটা কি—

হরকুমারও ছোটবৌয়ের মুখের সে ছবি কল্পনা করিয়া বার বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তাই তো, ছোটবৌকে কি বলিয়া—

*   *   *   *

এদিকে দ্বিধাবিভক্ত বাড়িতে দুই বৌ দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আপন আপন স্বামীর পথ চাহিয়া আছে। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, পল্লীগ্রাম প্রায় সুপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

বড়বৌ আপন মনেই মধ্যে মধ্যে বকিতেছিল, ও মা গো, কে বলবে সহোদর ভাই! এ যে মোগলের আড়ি! এ তো কখনও দেখিনি।

ছোটবৌ আবার ভীতু মানুষ—সে সভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

বড়বৌ এতক্ষণে তাহার বড় ছেলেকে বলিল, ওরে, একবার লণ্ঠন নিয়ে দেখ দেখি, কোথা গেল?

ওবাড়ির দরজা খোলার শব্দ হইতেই ছোটবৌও ছুটিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া ভাসুরপোকে বলিল, তোমার কাকার খোঁজও একটু নিও, রমেন!

ওবাড়ির দরজায় বড়বৌ দাঁড়াইয়া ছিল, সে আপন মনেই বলিল, ও তিনিও বুঝি বাড়িতে নেই? মাগো মা, ভাইয়ে ভাইয়ে এমন আড়ি তো কখনও দেখিনি; আ-মরি মরি, বালী আর সুগ্রীব! নিজের গণ্ডা নিয়ে হয়তো বুঝি, এ পরের নিয়ে কুকুরের ঝগড়া!

ছোটবৌ চুপ করিয়াই রহিল।

বড়বৌ বলিল, কে জানে—হয়তো দুজনে কোথাও মাথা ফাটাফাটি ক'রে প'ড়ে আছে!

ছোটবৌয়ের ভয়ে বুক গুরগুর করিয়া উঠিল, সে বলিল, কি হবে দিদি?

বড়বৌ বলিল, যাক গে তারা হাজতে হাসপাতালে, খিল বন্ধ ক'রে শুগে যা।

—দেখ দেখি বাপু, ধানপানের সময়, আর পোড়া গাঁয়ে তো ধান চুরির কামাই নেই। রাত্রে যদি চোর—।

—ওরে বাবা রে—ও কে গো! বলিয়া ছোটবৌ এবারে ছুটিয়া আসিয়া বড়বৌকে জড়াইয়া ধরিল।

বড়বৌ বলিল, কে—কে, কই—কে?

—ওই যে!

—আ-মরণ তোমার, ও যে গাছটার ছায়া!

—তা হোক, আমার বড় ভয় করছে দিদি।

—তবে ঘরে কুলুপটা দিয়ে আয়।

—যাক গে—মরুক গে, নিয়ে নিক চোরে সব।

—আয় দেখি। আমি দিয়ে আসি তালা।

তালা দিতে দিতে বড়বৌ বলিল, আমরা হলাম মেয়েমানুষ, আর আমরা তো এক মায়ের পেটের নই, আমাদের তো ঝগড়া হবেই। তোরা কেমন ধারার পুরুষ রে বাপু, যে মেয়ের কথায় মায়ের পেটের ভাইয়ের উপর খাঁড়া তুলে দাঁড়ালি।

ছোটবৌ বলিল, ঘেন্নার কথা দিদি। তাছাড়া পুরুষে নিজেরা ভেন্ন না হ'লে কি আমরা জোর ক'রে ভেন্ন হতাম! না, আমরা মামলা করতে গিয়েছি। আজ আমাদের ঝগড়া হয়, কাল মিটবে। পুরুষের কি এত কানপাতলাহওয়া ভাল, ছিছি, আমাদের ধমক দিয়ে থামিয়েদিলেই হ'ত।

বিধাতা-ডাক্তার অকস্মাৎ কাঁটাটা পাইয়া খুশি মনেই রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন; ক্ষতস্থান পাকিয়া কাঁটাটা আপনি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুই বৌয়ের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন, ওঃ ভাগ্যে তিনি বিবাহ করেন নাই।

শিবেশ্বর বাবু অকস্মাৎ গর্জ্জন করে উঠলেন—আশা—আশা—এই আশা!

রাগে তিনি যেন ফুলছিলেন। কন্যা আশার বয়স হয়েছে, সে সন্তানের জননী। সে আর বাপের ক্রোধকে তেমন ভয় করে না। আর অভ্যাসেও ভয় কেটে যায়। আশা এসে বল্লে, কি বাবা, এলোনা এখনও?

শিবেশ্বর বাবু বল্লেন—সেই ত বলছি। তোদের আমি সহ্য করতে পারি না ঠিক এই জন্যে।

প্রকাণ্ড মাথাটা এদিকে একবার ওদিকে একবার ঘুরে আবার সোজা হয়ে স্থির হ'ল।

আশা বল্লে—তা আমি কি করব বাবা?

—তবে সব করব আমি? জুতো মারব সে হারামজাদাকে। সে শূয়ার আমাকে বলে গেল, চারটের সময় মোটর নিয়ে আসব—কোথায় কি? রাস্কেল—ঈডিয়ট!

অগ্নি বর্ষণ হচ্ছিল ছেলে স্বধীরের উপর। স্বধীরের শ্বশুর বাড়ী শ্যামবাজারে। সেখানে শিবেশ্বর বাবুর আজ যাওয়ার কথা ছিল। স্বধীরের উপর আদেশ ছিল চারটের সময় মোটর নিয়ে সে ফিরবে এবং এক সঙ্গে সেখানে যাওয়া হবে। কিন্তু পাঁচটা বেজে গেছে তবু সে ফেরেনি। স্বধীর ইঞ্জিনীয়ার, সে স্বাধীন ভাবে কণ্ট্রাক্টরের কাজ করে। আশা বল্লে—একটু দেরী হলই বা—বাবা।

—দেরী হ'লই বা? চালাকী নাকি? দেরী হবে কেন? কেন হবে?

আশা বলে ফেল্লে—তোমাদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি কিন্তু বাবা।

শিবেশ্বর বাবুর চোখ দুটো হয়ে উঠল যেন গোল ভাঁটা ; ঠোঁট দুটো দৃঢ় চাপে উঁচু হয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা কম্পন এবং তৎসঙ্গে বিপুল গোঁফ জোড়াটাও ফুলে উঠল। এর পর তাঁর—তাঁর কথা ছিল —হয় গম্ভীর ভাবে হুঁম—নয়—এ্যাও।

আগে বাড়ীতেও এ্যাও চলত। কিন্তু আশার ছেলে রমু দেখে বলেছিল—ঠিক যেন হুমো বেড়াল।

তার উত্তরে লাউড স্পীকারের আওয়াজের মত এমন এক ধমক তিনি মেরেছিলেন যে রমু কেঁদে উঠেছিল। শিবেশ্বর বাবু সেই অবধি লজ্জিত হয়ে বাড়ীতে অভ্যাস করেছেন হুঁম !

যাক—এর পরই হুকুম হল—নিয়ে আয় আমার কাপড় জামা। আমি বেরুবো।

—দাদা—

—এ্যাও—

এমন একটা গর্জ্জনে আশাকে তিনি সম্বোধন করলেন যে আশা আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না।

কাপড় জামা হাতে দিয়ে আশা অনেক সাহস করে বল্লে—চিনে যেতে পারবে তো ?

চোখ গোল হয়ে উঠল, ঠোঁট নাক উঁচু হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ,—তাঁরপর—হুঁম্। যেতেপারবনা ? মীরাটের গলির চেয়ে বেশী গোলমেলে ক'লকাতার রাস্তা ? খাইবার পাসের চেয়ে দুর্গম ? ঈডিয়ট কোথাকার।

আশা সরে পড়ল।

বাইরের সিঁড়িতে লাঠির ও জুতোর সদম্ভ আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর সে বল্ল—মা গো—গোরা সেপাই ঘেঁটে ঘেঁটে বাবার মেজাজ ঠিক লড়াইএ গোরার মতই হয়েছে।

মা বল্লেন—গোরা নয় মা, তোমার বাবা—লড়াইএ মেড়া। গুঁতো খেয়ে খেয়ে আমার প্রাণ গেল।

শিবেশ্বর বাবু কলকাতায় এক রকম নতুন লোক। তাঁর এতটা বয়স বাংলার বাইরে কেটেছে। যুদ্ধবিভাগের কমিসারিয়েটে তিনি কাজ করতেন। যৌবনে বলতেন—হ্যাঁ, কাজ করতে হয় ত এই কাজ। বেটাছেলের কাজ। কামান গোলা বন্দুক আর সেপাইদের মধ্যে বাস না করলে উত্তেজনা কোথা? অন্য সব কাজ—সে হল মেয়ে মানুষের কাজ। ছিঃ—

ছেলে সুধীরকে তিনি রুডকীতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে দিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল তাকেও যুদ্ধ বিভাগে ঢোকাবেন। কিন্তু শেষে বদলে গেল মতটা। সুধীরের বিয়ে ঠিক হল কলকাতায় শ্যামবাজারে। ঘটকালী করেছিলেন শিবেশ্বর বাবুর সম্বন্ধী সুরেন্দ্র বাবু। মেয়ে দেখা থেকে সমস্ত পাকা কথা বার্ত্তা প্রায় কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। শিববাবুর স্ত্রী এসেছিলেন বাপের বাড়ী ভাইপোর বিয়েতে, সেই খানেই প্রতিবেশিনীদের মধ্যে রমাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে কথা-বার্ত্তাও স্থির হয়ে গেল। শিববাবু অমত করলেন না। ছুটির দরখাস্ত করলেন, ছুটিও মঞ্জুর হ'ল। তাঁর ইচ্ছে ছিল একমাত্র ছেলের বিবাহ বেশ খরচ করেই দেবেন। দিন স্থির হল আঠারই মাঘ। পৌষ মাসের শেষে সপরিবারে তাঁর কলকাতায় আসবার কথা। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সীমান্ত প্রদেশে গোল বেধে উঠল। ওদিকে বাচ্চাই সাকো আফগানিস্থানে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুল্‌লে। যুদ্ধ বিভাগ থেকে পরোয়ানা জারী হয়ে গেল—সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক, কখন রওনা হ'তে হবে তার কোন স্থিরতা নাই। সঙ্গে সঙ্গে শিববাবুর ছুটিও নামঞ্জুর হয়ে গেল। উপায় নেই। কিন্তু

শিববাবু একটা ভীষণ দিব্যি দিয়ে বললেন—আবার বাংলায় যদি কেউ এ মিলিটারিতে কাজ করে সে শূয়ার, সে গাধা। তাকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করব, সে ছেলেই হোক—আর নাতিই হোক।

যাক্ বিবাহ হয়ে গেল। ছেলের মামাই বরকর্ত্তার কাজ করলেন। বিবাহের পর বৌ নিয়ে শিববাবুর পরিবারবর্গ মীরাটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে আদেশ দিলেন, বাড়ী-ঘর তৈরী কর—আর সুধীর সেখানে কণ্ট্রাক্টরের ব্যবসা করুক। এ ঝঞ্ঝাট মিটলেই আমি রিটায়ার করব।

বালীগঞ্জে বাড়ী হল। সুধীর আপিস খুল্লে। তার শ্বশুর ধনপতিবাবু সত্যিই ধনপতি। তাঁর মহাজনী কারবার ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জামাইয়ের সঙ্গে ব্যবসায়ে নামলেন। তিনি দেখতেন হিসেব—সুধীর আঁকত প্ল্যান, তিনি খাটাতেন মজুর—সুধীর গাঁথুনীতে মারত লাথি।

যাক্ শিবেশ্বরবাবু পরশু সন্ধ্যায় এখানে এসেছেন তল্পী তল্পা-গুটিয়ে। ইতিমধ্যে মাসখানেক হল সুধীরের একটি খোকা হয়েছে। শিববাবু পৌত্র দেখবার জন্যে মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—সুধীরকে বল্লেন—শ্যামবাজার যাব বৌমাকে দেখতে। শ্বশুরকে বলবি তোর—তাঁর ওখানে আজ আমার নেমন্তন্ন।

সেই নিমন্ত্রণ নিয়ে এত ব্যাপার।

শিববাবু রাস্তায় ভাবলেন একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক। কিন্তু আবার মনে হল—এখানকার ড্রাইভাররা শোনা যায় অনেক গুণ্ডা! তার চেয়ে বাস অনেক ভাল—শ্যামবাজারে যাবেই সে—পথ ভোলা তার চলবে না। অন্ততঃ যাত্রীরা পথ ভুলতে দেবে না। কাজেই বাস-ষ্ট্যাণ্ডে এসে দুবার তিনবার শ্যামবাজার লেখা পড়ে, তিনি উঠলেন বাসে। কণ্ডাক্টর হাঁকছিল—ধরমতলা—ডালহৌসি—শ্যামবাজার।—বাস ছাড়ল।

যাত্রী কম, এক এক সীটে একজন বসেছিলেন। বাসখানা ধীরে ধীরে যায় আর থামে। থামল যদি ত যেতেই চায় না। শিবেশ্বরবাবু চটে উঠলেন—চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত যেতেই আধ ঘণ্টা লেগে গেল। তিনি চটে বল্লেন—কি করছ তোমরা ? আমার যে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কণ্ডাক্টর উত্তরই দিল না।

তিনি বল্লেন—এই।

কণ্ডাক্টর বল্লে—কি এই—এই বলছেন মশাই ? আমরা অমনি ভাবেই যাই। ভারি—! শিববাবুর ঠোঁট, নাক, গোঁফ ফুলে উঠল,—তারপর 'এ্যাও'। কণ্ডাক্টরটা চমকে উঠল।

একজন সহযাত্রী বল্লে—আপনি ট্রামে চড়লেন না কেন ? ওদের সঙ্গে মারামারি করে কি করবেন ?

—ও। আচ্ছা তাই যাব আমি। এই রোখো, রোখো। ময় উতার যাউঙ্গা—

গাড়ী ডালহৌসী স্কোয়ারের কোণে এসে পড়েছিল, তিনি সেইখানে নেমে পড়লেন। ট্রাম আসে—যায়, শিববাবু ঘাড় উঁচু ক'রে পড়েন শ্যামবাজার লেখা আসে কি না।

অবশেষে শ্যামবাজার এল। ছুটির সময়—কুচকীকণ্ঠায় যাত্রী ঠাসা। শিববাবু উঠে পড়লেন। ভিতরে স্থানাভাব। একটি সীটে একা ডিস্‌পেপসিয়ার রোগীর মত খিটখিটে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন।

শিববাবু টাল খেতে খেতে গিয়ে সেই সীটে ধপ করে ব'সে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ভুঁড়িতে কাতুকুতুর মত একটা কনুইএর গুঁতো খেয়ে দেখলেন সেই খিটখিটে বৃদ্ধের কনুইটা তাঁর ভুঁড়িতে বিদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর চোখ দুটো পাকিয়ে উঠল—নাক ঠোঁট গোঁফ ফুলে খাড়া হয়ে উঠল। তারপর—হুঁম্।

খিটখিটে বৃদ্ধ চশমাসুদ্ধ দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর ফেলে, মুখটা বিকৃত করে উঠলেন। শিববাবুর মাথাটা ক্রোধে বার চারেক এদিক ওদিক ঘুরে গম্ভীর ভাবে সোজা হল। তারপর তাঁর বিশাল বাহু দিয়ে সহযাত্রীর প্যাকাটির মত হাতটা সরিয়ে দিয়ে বল্লেন, হটাও।

খিটখিটে বৃদ্ধ একটা তীব্র দৃষ্টি হানলেন।

উত্তরে শিববাবু চোখ পাকিয়ে ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে ওঠে নাক, ঠোঁট, গোঁফ।

ওপাশের বৃদ্ধ বাইরের দিকে চেয়ে বল্লেন—কি বিশ্রী চেহারা! শিববাবু একটা অগ্নিদৃষ্টি হানলেন। মাথাটা বার দুয়েক ঘুরল। তিনি একটু চেপে বসলেন।

রোগা ভদ্রলোক জাঁতিকলে ইঁদুরের মত ট্রামের দেওয়ালের সঙ্গে চেপ্টে লেগেছিলেন—তিনি কনুয়ের গুঁতো দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বল্লেন—সরে বসুন মশাই! শিববাবু আর একটু চেপে বসলেন।

—শুনতে পাচ্ছেন না?

উত্তর নেই। আরও একটু চেপে গম্ভীর ভাবে শিববাবু সম্মুখের রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন।

—এই ঢাউস—পেট মোটা বেলুন—

—এ্যাও।

চোখ পাকিয়ে গোঁফ ফুলিয়ে শিববাবু কঠোর ভাবে সহযাত্রীর দিকে চাইলেন।

খিটখিটে বৃদ্ধও রোষে দাঁত খিঁচিয়ে কটমট করে তাঁর চোখে চোখ রাখলেন।

শিববাবু ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন—খেঁকী কুকুর যেন! খিটখিটে বৃদ্ধ রাগে পাগল হয়ে উঠলেন—বল্লেন, খবরদার! আরও একটু চাপ দিয়ে

শিববাবু বল্লেন—ছুঁচোর মত ছুঁচলো মুখ। সহযাত্রীর নড়বার ক্ষমতা ছিল না—নইলে নিজের অবস্থা ভুলে যুদ্ধ আহ্বান করতেন। এখন অতি কষ্টে বল্লেন, আর তুই—তুই ত হুমো বেড়াল—

—এ্যাও।

—কি!

সেটা কিন্তু পিষ্ট অবস্থার জন্য অনুনাসিক হয়ে চিঁর মত শোনাল।

শিববাবু বল্লেন—চেপ্টে চিঁড়ে বানিয়ে দেব তোকে।

—আমি নালিশ করব। সাক্ষী থাকুন আপনারা। অন্যান্য সহযাত্রীরা সকলেই ঘটনাটা লক্ষ্য করেছিলেন—কিন্তু তাতে এতক্ষণ আশঙ্কার চেয়ে আনন্দই পেয়েছিলেন বেশী—সকলেই হাসছিলেন। এখন রোগা বৃদ্ধের অবস্থা দেখে সকলেই শঙ্কান্বিত হয়ে উঠলেন।

একজন তিরস্কার করে বল্লেন—একি মশাই—দুজনেই আপনারা বয়স্ক লোক—একি আপনাদের আচরণ?

কণ্ডাক্টর এসে শিববাবুকে ব'ললে—আপনি এদিকেএসে বসুন বাবু।

ওদিকে একটা সীট খালি হয়েছিল।

শিববাবু বল্লেন—কভি নেহি। দরকার হলে উনি যেতে পারেন।

উনি বল্লেন—আমিই বা যাব কেন? আমারও **right** আছে এ seatএ বসতে।

সহযাত্রীরা অনুরোধ করলে—তাহলে মশাইরা মারামারি করবেন না যেন!

কিছুক্ষণ চুপ চাপ।

ওপাশের বৃদ্ধ পেষণের কষ্ট ভুলতে পারেন নি। নিম্ন কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—ইডিয়ট—

—এ্যাও। শিববাবুর নাক ঠোঁট গোঁফ ফুলে উঠল।

এ্যাও

—চোপ।

সকলে আবার বলে উঠল—একি মশায়, আবার?

আবার চুপচাপ। কিন্তু মনের রোষে দুজনেই ফুলছিলেন?

শীর্ণ বৃদ্ধ প্রায় মনে মনেই বল্লেন—হুতোম পেঁচা—

শিববাবুর কান বড় তীক্ষ্ণ—বার দুই ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বল্লেন,—চামচিকে তুই।

—হাতী তুই।

—ঘাড় লম্বা জিরাফ তুই।

—ননসেন্স।

—রাস্কেল।

—ড্যাম।

বেড়ালের ইঁদুর ধরার মত শিববাবু খপ ক'রে দুই হাতে বৃদ্ধকে ধরে ফেল্লেন।

হাঁ হাঁ করে সকলে এসেপড়তেপড়তেদুটোঝাঁকিতিনিদিয়েফেল্লেন।

তারপর কণ্ডাক্টর বল্লে—নেবে যান আপনারা বাবু। এরকম—

শিববাবু চেপে বসলেন—কভি নেহি।

রোগা বৃদ্ধের কিন্তু আর সাহস ছিল না, তিনি স্বেচ্ছায় নেমে গেলেন।

অনেক প্রশ্ন করে অবশেষে ঘুরতে ঘুরতেশিববাবু বেহাইএর বাড়ীর রাস্তা পেলেন। মনে মনে তিনি সুধীরের বাপান্ত করছিলেন।

২০নং বাড়ীতে যেতে হবে তাঁকে। আঠারো নম্বরের কাছাকাছি আর একটা গলি ঐ রাস্তাটাকে কেটে চলে গেছে, সেখানে আসতেই ও মোড় থেকে সেই রোগা বুড়োর সঙ্গে দেখা।

রোগা বুড়ো এতক্ষণে খাপ্পা খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। লাফিয়ে উঠে বল্লেন—এইবার কি হয় শালা—

—এ্যাও। গর্জ্জন করে শিববাবু কাপড় সাঁটতে প্রবৃত্ত হলেন।

পিছন থেকে একখানা মোটরের হর্নে দুজনকেই সরতে হল। মোটরটা থেমে গেল।

সুধীর মোটর থেকে নেমে বল্লে—এই যে—আপনাদের পরিচয় হয়ে গেছে।

দুই বৃদ্ধই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুধীর বল্লে—আমার একটু দেরী হয়ে গেল, ফিরে এসে অফিসে দেখি আপনি চিঠি রেখে বাসে চলে এসেছেন, বাড়ী গিয়ে দেখি আপনিও বেরিয়ে এসেছেন।

শিববাবু মোটা হলেও বুদ্ধিমান লোক—দু বাহু বিস্তার করে ধনপতিবাবুকে জাপটে ধরে বল্লেন—বেহাই ? ! ! ? সুধীরের একটু ধাঁধা লাগল—সে বল্লে—সে কি আপনাদের পরিচয়—

শিববাবু বল্লেন—হয়ে গেছে।

ধনপতিবাবু তখন আলিঙ্গনের চাপে কোঁক কোঁক করছিলেন।

আধলা ও পয়সা

দেশলাইয়ের বাজারে আগুন লাগিয়া গেল। দেশলাইয়ের কারখানায় বা গুদামে নয়, আগুন লাগিল দেশলাইয়ের দামে, আধপয়সার দেশলাইয়ের দাম চড়িয়া হইল এক পয়সা। বাক্সের গায়ে লেখা থাকে 'চল্লিশ কাঠি'; কিন্তু 'ত্রিশ কাঠির বেশী থাকে না, তাহার মধ্যেও আবার পাঁচটা কাঠির মাথায় বারুদের টুপী থাকে না, আর পাঁচটা কাঠি থাকে ভাঙা। সহরে একদফা 'সিগারেট-লাইটার' হু-হু করিয়া কাটিতে আরম্ভ করিল। পকেট-কাটাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল, এখন পকেট কাটিলে প্রথমেই হাতে আসিয়া পড়ে সিগারেট-লাইটার। পল্লীগ্রাম কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল অর্থাৎ পিছাইয়া গেল—সেখানে পুরাতনের পুনরাবির্ভাব হইল—নূতন করিয়া উঠিল 'চকমকি'। মহুগ্রামের মদন কর্ম্মকার কিছুদিন হইতে ক্রমাগতই চকমকির জন্য ইস্পাতের বেঁকী তৈয়ারী করিতেছে—কিন্তু একটাও পড়িয়া নাই।

ভুলু দত্ত তিনপুরুষে মহাজন এবং ব্যবসায়ী, সেও দেশলাই লইয়া কারবার বন্ধ করিল। অবশ্য বিক্রয় করা বন্ধ করিল না, নিজে ব্যবহার বন্ধ করিল। মদনের নিকট হইতে চারিটি বেঁকী সে কিনিয়া আনিল। একটা রাখিল দোকানে, একটা রাখিল বাড়ীতে, একটা তাহার নিজের পকেটে, অপরটা তাহার পুত্র মরিরামকে দিয়া সে বলিল—নে এটা রাখ।

মরিরাম পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বুঝিতে পারিল না—কোথায় রাখিতে হইবে। ভুলু দত্ত দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—পকেটে, পকেটে রাখ নবাবজাদা, পকেটে রাখ। পাথর একটা কুড়িয়ে নিও, আর বাঁশের চুঙির ভেতর খানিকটে হলুদ রংএর কন্থা, বুঝেছ?

মরিরাম বিরক্ত হইয়া বলিল—পকেট ছিঁড়ে যাবে।

অত্যন্ত বিরক্তিভরে ছেলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া দত্ত বলিল—ওরে শূয়ার, জামাগুলো আমাকে দিস, খেড়ো কাপড়ের পকেট একটা করে জুড়ে দেব।

মরিরাম গোঁ গোঁ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

দত্ত বলিল—বেটা বন-শূয়ার রে—শুধু শূয়ার নয়!

দত্তর মুদীখানার পাশেই মরিরাম পিকচার ও আয়নার এক দোকান করিয়াছে। সেইদিনই অপরাহ্ণে দত্ত দেখিল, এক মরিরাম দশটা হইয়া একসঙ্গে দশটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া বিড়ি ধরাইতেছে। সে নিজেও ওই দেশলাইয়ের কাঠির মত ফস্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—মরে, বলি ও শূয়ার, এতগুলো কাঠি একসঙ্গে জেলে কি মা লক্ষ্মীর চিতে তৈরী করছিস নাকি?

উত্তেজনায় সে ভুলিয়া গেল যে দশটা মরিরাম এবং দশটা প্রজ্বলিত দেশলাইয়ের কাঠি দর্পণে দর্পণে একেরই প্রতিবিম্ব মাত্র।

মরিরামও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার এই নূতন বয়সে পিতার এই অতিরিক্ত রকমের কার্পণ্যের কড়াকড়ি ভাল লাগিত না। সে বলিল, বলি, দশটা কাঠি কোথা জ্বাললাম শুনি? একটাই ত জ্বাললাম।

—কেন, তাই বা জ্বালবি কেন? জানিস, ওই একটা কাঠিতে গাঁ শুদ্ধ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

—তাই বলে 'ইয়ে' খেতে পাব না না-কি?

মরিরাম ভয়ানক চটিয়াছিল, তবুও সে পিতার সম্মান রাখিয়া 'বিড়ি' না বলিয়া 'ইয়েই' বলিল।

দত্ত বলিল—তা' 'ইয়ে' খাও না কেন! কিন্তু দেশলাই জ্বালবি কেন? বলি তোর চকমকি কি হ'ল, চকমকি?

গোঁ গোঁ করিতে করিতে মরিরাম বলিল—বিশটা ঠুকে এক ফুলকি আগুন বেরোয় না, উ আমি—!

বাধা দিয়া দত্ত বলিল—ওরে শূয়ার, ভাল দেখে 'ঘোড়াখুরে' পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আয়।

মরিরাম অন্তরাল হইতেই পিতাকে মুখ ভেঙ্গচাইয়া, দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী নাড়িয়া কদলী প্রদর্শন করিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর দত্ত বলিল—দেখিস দোকান রহিল! আমি একবার গোপালপুর চললাম তাগাদায়।

গোপালপুর এখান হইতে ক্রোশখানেক দূর, সমস্ত পথটাই লালমাটির পাথুরে ডাঙ্গার উপর দিয়া যাইতে হয়। যাইবার পথেই দত্ত বাছিয়া এক পকেট চকমকির পাথর সংগ্রহ করিল। তাগাদা করিয়াও অপর শূন্য পকেটি শূন্যই রহিয়া গেল—একটি তাম্রখণ্ডও তাহাতে প্রবেশ করিল না। বিরক্তমনে দত্ত ফিরিবার পথে আবার এক পকেট পাথর কুড়াইয়া লইল।

আর স্থান নাই, তবুও পাথর চোখে পড়িতেছিল। দত্তকে অগত্যা উপেক্ষা করিতে হইল। এই একটা, ওই একটা, এই আবার একটা —আবার একটা! এটা কিন্তু মস্ত বড়, আর বেশ রকমারি দেখিতে। সাধারণত এমন পাথর ত' দেখা যায় না। দত্ত সেটাকে কুড়াইয়া লইল স্থানাভাবে সারাটা পথ সেটাকে হাতে করিয়াই লইয়া আসিল।

দত্ত বিপত্নীক। রাত্রে সে নিশ্চিন্ত হইয়া পাথরগুলাতে ইস্পাতের বেঁকী ঠুকিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। প্রথমেই সে ঠুকিল বড় পাথরটা।

ওরে বাপরে! এ যে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড! আগুনের ফুলকি তুবড়ি বাজির মত ঝরে যে? আগুনের ফুল দেখিয়া দত্তর বড় আনন্দ হইল; পরম কৌতুকে সে শিশুর মত বারবার পাথরটাতে ইস্পাতের

বেঁকী ঠুকিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সন্তুষ্ট হইয়া সে স্থির করিল, ইহারই এক টুকরা মরে হারামজাদাকে দিতে হইবে। উঃ—কাপড় পোড়ার গন্ধ ওঠে যে··! চারিদিকে চাহিয়া দত্ত দেখিল—ছেঁড়া বিছানার তুলায় আগুন ধরিয়াছে, বিছানা পুড়িতেছে। পাথরটাকে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দত্ত আগুন নিবাইতে বসিল।

সর্ব্বনাশা পাথর! আবার কিছুক্ষণ পর দত্ত উঠিয়া পাথরটাকে সযত্নে তুলিয়া লইল।

দিন দশেক পর, সেদিন সন্ধ্যায় দোকান হইতে ফিরিয়া তামাক খাইবার জন্য চকমকি ঠুকিতে গিয়া দত্ত দেখিল পাথরটা নাই। সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পাথরটার জন্য আপনার বালক পুত্রগুলির মাথা খাইতে আরম্ভ করিল,—মরেও না হারামজাদা শূয়াররা! ছত্রিশ কোটী যদুবংশের মত মাটি করলে, ফেরার করলে আমাকে! এক একটা ক্ষুদ্দুর রাক্ষস—আধসের চালের ভাত খাবে....।

তারপর মৃতা পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আরে মাগী, মরলি মরলি—আমার জন্যে একপাল শূয়ার পালতে রেখে গেলি! মরেও নারে ··।

বাধা দিয়া বিধবা ভগ্নী মানদা বলিল—বলি, কি এমন পাথর দাদা যে এই ভর সাঁঝে কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে তুললে।

—সে পাথরে এক ঠোকরে লঙ্কাকাণ্ড হয়,—তোর কুরুক্ষেত্তর ত' পরের কথা! বলুক—কে কোথায় ফেলেছে! নইলে কুরুক্ষেত্তর ত' হবেই, শেষ পর্য্যন্ত 'মুষলং কুলনাশনং' করব আমি—বলে দিচ্ছি।

দত্তর মেজ ছেলে হরেরাম এই সময় বাড়ী ঢুকিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিল—খুদে যে একটা পাথর নিয়ে গোয়ালবাড়ীতে ঠাকুর পুজো করছে—পিদিম জেলে, ধূপ দিয়ে—

দত্ত আঁতকাইয়া উঠিয়া ছুটিল, খালভরা ছেলেকে খাল কেটে পুঁতব আজ। কোনদিন সত্যিই লঙ্কাকাণ্ড করে ছাড়বে দেখছি।

খুদিরাম দত্তর কনিষ্ঠ পুত্র। মহাক্রোধে ছুটিয়া গিয়াও কিন্তু দত্ত ছেলেকে প্রহার করিতে পারিল না। একটা ইটের উপর পাথরটাকে রাখিয়া, তাহার সম্মুখে প্রদীপ জ্বালাইয়া খুদিরাম ধ্যানী-বুদ্ধের মত বসিয়া আছে। দত্ত চমৎকৃত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। ছেলের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি নয়, সে দেখিতেছিল—এ কি—প্রদীপের ছটায় পাথরটা আর একটা প্রদীপের মতই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে যে…! সে চিলের মত ছোঁ মারিয়া পাথরটাকে তুলিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর আসিয়া হাঁকিল—মানদা, একটা আলো, হ্যারিকেন একটা, শীগগির, জলদি, তুরন্ত নিয়ে আয়।

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল—যেন ঢেঁকীতে ঘা পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল এইখানেই এক রেলের বাবু এক পাথর পাইয়াছিল, তাহার দাম হইয়াছিল পাঁচ হাজার টাকা।

মানদা আলো রাখিয়া গেল। দত্ত দেখিল পাথরটার উপরের খানিকটা চটা ছাড়িয়া গিয়াছে—সেইখানে আলোকের প্রতিবিম্ব আর একটা আলোক-শিখার মত দপ্‌দপ করিয়া জ্বলিতেছে। ভিতরে যেন দাড়িমের দানার মত কি সব রহিয়াছে। সে আলোটার শিখা বাড়াইয়া দিল, পাথরটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আলোটা আরও বাড়াইয়া দিল। হুঁ—পাথরটা আরও…। এই সময় আলোর চিমনীটা চড়াৎ করিয়া ফাটিয়া ভাঙিয়া গেল।

দত্ত হাঁকিল—মরে, মরে! ওরে ও শূয়ার!

মানদা উত্তর দিল—সে কোথায় গানবাজনা করতে গিয়েছে, বাড়ীতে নেই।

দত্ত আগুন হইয়া বলিল—হারামজাদা শূয়ার গান-বাজনা করতে গিয়েছে, না চোদ্দ-পুরুষের পিণ্ডি দিতে গিয়েছে! তানসেন আমার!

বলিতে বলিতে সে নিজেই বাহির হইয়া গেল। আধ ঘণ্টা পরে একটা হেজাক বাতি ও একটা টর্চ্চ লইয়া সে বাড়ী ফিরিল। উজ্জল আলোকে পাথরের ভিতরটা যেন বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছিল।

মধ্যরাত্রে মানদার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে অবাক হইয়া গেল—তাহার দাদা গান করিতেছে। বেশ স্ফুট কণ্ঠেই গাহিতেছে—তা-নে—না-নে—নানে-না . । আবার মাঝে মাঝে তাল মারিয়া বলিতেছে—হা!

দত্ত বেশ বুঝিল পাথরটা মূল্যবান্। নানাভাবে সে পরীক্ষা করিল। সে শেষ-পরীক্ষা করিল কাচ কাটিয়া। শয়নকক্ষে—শয্যার শিয়রে দেওয়ালে তাহার ইষ্টদেবীর একখানা ছবি টাঙ্গানো ছিল, সেইখানাকেই সে নামাইয়া লইয়া ছবিখানা খুলিয়া লইল। তারপর কাচখানার উপর পাথরটাকে দিয়া একটা দাগ টানিয়া দিল। কাচখানা কাটিয়া বেশ একটা দাগ পড়িল। একটু চাপ দিতেই কাচখানা ভাঙ্গিয়া দাগে দাগে দুই টুকরা হইয়া গেল। খুশী হইয়া সে বার বার দাগ টানিয়া ঘরখানা কাচের টুকরায় একরূপ 'শরশয্যা' করিয়া তুলিল। তাহার নিজের হাত দুইখানাও তখন কাটিয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেদিকে তাহার দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল না। বেদনা-বোধও যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দত্ত যেন পাগল হইয়া উঠিল।

অবশেষে সে মরিরামকে ডাকিয়া কথাটা গোপনে বলিল। তারপর বলিল—চল, কলকাতা যাই। যে রকম ওজন আর যা তোর জিল্—তাতে লাখখানেক ত দাম হবেই।

ছেলে বলিল,—তারা যদি ঠকিয়ে নেয়!

দত্ত ভাবনায় পড়িল। পাঁচ সাতদিন অনেক চিন্তা করিয়া শেষে সে

স্থির করিল, রজনী রায়কে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। রজনী এই গ্রামেরই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, সে কলিকাতায় থাকিয়া লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের দালালী করে।

দত্ত পাঁজী খুলিয়া শুভদিনে মাহেন্দ্রযোগ দেখিয়া ছেলেকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইল।

রজনী সমস্ত শুনিয়া ও পাথরটা দেখিয়া বলিল—তা' বেশ, আমার দ্বারা যা হবে সে আমি করব।

রজনীর পায়ের ধুলা লইয়া দত্ত বলিল--চিরকাল আমরা আপনাদের আশ্রিত। আপনার ভরসাতেই আমার সাহস করে আসা এখানে।

রজনী বলিল—কিন্তু এসব পাথর-টাথরের ব্যাপার ত' আমি জানি না কিছু। এসবের দালাল আছে আলাদা।

বাধা দিয়া দত্ত বলিল—আজ্ঞে না, দালাল-টালালের আমার কাজ নেই। আপনি আমাকে বড় বড় জহরতের দোকানগুলো একবার ঘুরিয়ে আনবেন। যা হয় আমার তাতেই হবে।

রজনী বলিল, বেশ!

দত্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার অংশের খাজনা এবার সব আমি মিটিয়ে দিয়ে এসেছি রজনীবাবু!

এই সময় কে উচ্চকণ্ঠে নীচে ডাকিল—Expenditure আছ নাকি?

রজনী বলিল—এই ঠিক হয়েছে, ঠিক লোক পাওয়া গেছে। আমার ব্যাই বিমল মুখুজ্জে এসেছে—ওই পারবে, দাঁড়াও।

তারপর সে বারান্দায় বাহির হইয়া ডাকিল—আরে এস, এস, ব্যাই, এস।

ফিটফাট চটক্‌দার চেহারার এক ভদ্রলোক চটপট আসিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল—নন্‌সেন্স, ব্যাই কি—ব্যাই কি? Expenditure

বল? 'ব্যয়' শব্দ থেকে 'ব্যাই' কথার উৎপত্তি! 'ব্যয়' না করলে 'ব্যাই' পাওয়া যায়? Say—Expenditure।

রজনী হাসিয়া বলিল—কি রকম, রঙে আছ নাকি?

বিরক্তিভরে ভদ্রলোক বলিল—সেভেন্ হাণ্ডস্ আর্থ ডিগ করে একটা পাইস পাওয়া যায় না স্যার—colour হবে কোত্থেকে বল? কালারের মধ্যে কালার—all white! বড় জোর তার মধ্যে ছিটে ফোটা mustard flower—তাও ভেসে বেড়াচ্ছে।

রজনী বলিল—বস বস; তোমার কথাই ভাবছিলাম। এখন একটা জহরতের দালালী করতে পারবে?

সবিস্ময়ে বিমল বলিল—জহরৎ! জুয়েলস্! হীরা মণি? Copper-she, I mean, তামাসা করছ না ত?

—না, না, তামাসা নয়। আমাদের গ্রামের ইনি একটা পাথর কুড়িয়ে পেয়েছেন—দামী পাথর।

হা-হা করিয়া হাসিয়া বিমল বলিল—Village-go টেনেছ নাকি? গাঁজা-গাঁজা, Village মানে গাঁ—go মানে যা। কুড়িয়ে জহরৎ ···!

কথাবার্ত্তা শুনিয়া দত্ত ঘামিয়া উঠিতেছিল। রজনী বলিল—বেশ ত' তুমি পাথরটা দেখ না। অন্ধকার ঘরে আলোকচ্ছটায় পাথরটার দীপ্তি দেখিয়া, কাচ কাটিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া বিমল বলিল—একেই বলে, Leaf-covered forehead—পাতা-চাপা কপাল। ভাল, এখন কমিশনের কথা হয়ে যাক। yes, পাথর দামী বলেই মনে হচ্ছে, বেচে আমি দোব—কিন্তু twenty five per cent দালালী দিতে হবে আমাকে। সিকি সিকি লাগবে—বুঝেছ কর্ত্তা।

দত্ত জোড়হাত করিয়া বলিল—মার্জ্জনা করবেন। দশটি টাকা পান খেতে আপনাকে দোব আমি, কাজটি আমার করে দিতে হবে।

পকেট হইতে একটি আধলা বাহির করিয়া দত্তর হাতে দিয়া বিমল বলিল—একখিলি পানের দাম আধপয়সা, তুমি কিনে খেয়ো ; অনেক বকেছ।

বলিয়া সে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। দত্ত প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে ঘোরটা কাটিতেই গোটা একটি পয়সা বাহির করিয়া বিমলের হাতে দিয়া বলিল—ওতে আপনার পানবিড়ি দুই হবে। আমার চেয়ে আপনি বেশী বকেছেন।

বলিয়া সে সটান গিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার ছেলে তখন বাসায় ছিল না—সে 'সেলুনে' চুল ছাঁটিতে গিয়াছে। বিমল পয়সাটি পকেটে পুরিয়া বলিল—Old dove রে বাবা! এ মার্কেটে নিভ্‌ল্ বেচা মুস্কিল। ওহে কত্তা, শোন, শোন। বলি, শতকরা পনের দেবে তুমি?

—আজ্ঞে না, মোটমাট দশ বলেছি ; পঁচিশ বড় জোর দিতে পারি। তার বেশী একটি 'ছিদেম' বললে আমি পারব না।

অনেক মারামারি করিয়া অবশেষে পঞ্চাশ টাকা দালালী খতম হইল। বিমল বলিল—আমি ঠিক একটার সময় আসব ; বাড়ী ঢুকব—তোপ পড়বে। তোমরা ঠিক 'রেডী' থাকবে।

রজনী বলিল—দেখ, যেন unready হয়ে পড়ো না কোন রকমে।

বিমল বলিল—ননসেন্স, I am more ready than your ever-ready batteries, you know.

সে চলিয়া গেল।

প্রথমেই তাহারা গেল হ্যামিল্টন কোম্পানীর দোকানে। দোকানের জাঁক-জমক ও সাহেব-মেমের ভিড় দেখিয়া দত্ত ভড়কাইয়া গেল। ছেলেটা কখনও দেখিতেছিল—ঘড়ি, সিগারেটের পাইপ, কখনও বা আড়চোখে

মেম সাহেবদের দেখিয়া লইতেছিল। বিমল সাহেবদের সহিত ফর্ ফর্ করিয়া ইংরেজীতে আলাপ জুড়িয়া দিল। মিনিট দুয়েক পরেই সাহেব খাতির করিয়া সকলকে বসিতে অনুরোধ করিল।

পাথরটা বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া সাহেব খাসা বাঙ্গলায় বলিল—অনুমান হয় এটি দামী পাথরই আছে। কিন্টু টেষ্ট না করিয়া কিছু বলা যায় না। You know—All that glitters is not gold. তবে আপনারা এটা কাটাইয়া ফেলেন।

দত্ত বলিল—আচ্ছা, কি রকম দাম হবে?

সাহেব হাসিয়া বলিল—well, ঠিক কি করিয়া বলি। তবে ভাল জিনিস হলে দু' লাখ, তিন লাখ, কি তারও বেশী হ'তে পারে।

দত্ত বলিল—তা' আপনারা আমাকে এক লাখ টাকা দিয়ে এটা নিয়ে নেন, তারপর আপনারা কাটিয়ে নেবেন।

সাহেব আবার একটু হাসিয়া বলিল—এ অবস্থায় আমরা এক টাকা দিয়াও এ পাথর নিব না। বড়বাজারে আপনারা যান—সেখানে বাঁশটোলা লেনে যারা জহরৎ কাটে, তাদের দিয়া কাটাইয়া ফেলেন। তারা পাকা লোক, ঠিক বলিয়া দিবে—কাটাইলে মুনাফা দিবে কি-না। কোন ডর নাই—ওরা খুব honest লোক।

দোকান হইতে বাহির হইয়া বিমল বলিল—আজ আর না। Backএ লোক লেগে থাকতে পারে। কাল দশটায় আবার বেরুব।

দত্ত বলিল—আরও দু-চারটে দোকান—।

বিরক্ত হইয়া বিমল বলিল—আমি চল্লাম বাবা। ছুরি খেয়ে life give কে করবে বাবা! দত্ত শিহরিয়া বলিল—না থাক, তবে কাজ নেই!

সন্ধ্যায় মরিরাম গিয়াছিল রজনীর সঙ্গে সিনেমা দেখিতে। মরিরামকে বাসায় পৌছাইয়া দিয়া রজনী বলিল, তুই যা, আমার একটু কাজ আছে—

সেরে আসছি। বাড়ীতে ঢুকিয়া মরিরাম শুনিতে পাইল ঘরের মধ্যে তাহার বাবা কাহার সহিত কথা কহিতেছে। দরজা বন্ধ।

তাহার বাবা বলিতেছিল—মেয়ে যদি ভাল—মানে সুন্দরী হয়—আর ধরুন একটু বড-সড় হয়—তবে না-হয়—গরীবেব কন্যাদায় বিনা-পণেই—

ডুবড়ীর মত বিমল বলিয়া উঠিল—পরমাসুন্দরী মেয়ে, ফেয়ারী কুইন—গডেস্—দেবকন্যা বললেই হয়। বয়সও তোমার পনের-ষোল। লেখা-পড়া জানে—গান জানে।

মরিরাম বুঝিল তাহার বিবাহের কথা হইতেছে। সে পুলকিত হইয়া উঠিল। ঘরে না ঢুকিয়া সে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে আরম্ভ করিল।

দত্ত বলিল—গানটান গুলো আজকালকার ফেশান হয়েছে বটে! আবার কিছুক্ষণ পর বলিল—তা অবিশ্যি ভালও বটে, এক হিসেবে। মন টন খাৎাপ হ'লে একখানা গান যদি স্ত্রী শোনায়—সে ভালই। আমার ইচ্ছে ত বটে মুখুজ্জে মশায়—কিন্তু উপযুক্ত ছেলে....।

বিমল বলিল—আরে বাপের দুঃখ উপযুক্ত ছেলেতে যদি না বুঝলে—তবে আর উপযুক্ত কিসের? আব তোমার চিন্তাই বা কিসের? তুমি ত' তাদের ভাসিয়ে দিচ্ছ না! এই ধর তুমি তিনলাখ টাকা ত' পাবেই। দু লাখ তুমি ছেলেদের দিয়ে বল—এই নে বাবা—নিয়ে তোরা যা খুশী কর, আমাকে ছেড়ে দে। তুমি ঐ এক লাখ নিয়ে ঘর-সংসার পাত। আরে তোমার বয়সে লোকে হাজার হাজার বিয়ে করেছে। বেশী লজ্জা হয়, তুমি এই কলকাতায় বাড়ী কিনে বাস কর। হাজার কুড়ির একটা লাইফ-ইন্‌সিওর ক'রে ফেল—একখানা গাড়ী কেন—সন্ধ্যের সময় গঙ্গার ধারে সস্ত্রীক হাওয়া খেয়ে বেড়াও, সিনেমা দেখ, ব্যাস্ মরিরাম শিহরিয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গে তাহার ঘাম ঝরিতেছিল।

দত্ত বলিল—তবে তাই আপনি ঠিক ক'রে দেন। আমারও ত' ধরুন বুড়োবয়েস আছে, তখন যদি ছেলের বৌ-রা সেবা না-ই করে!—কি বলেন?...

বিমল বলিল—আজই রাত্রেই গিয়ে আমি ঠিক ক'রে ফেলছি। সে ভদ্রলোক কৃতার্থ হয়ে যাবে। বল্লাম যে পরমা সুন্দরী—বয়েস তোমার পনের-ষোল; তবে টাকাকড়ি কিছু দিতে হলে—পারবে না।

দত্ত বলিল—রাম রাম, মুখুজ্জে মশায়, বিয়ের টাকাতে কি কিছু হয়—না লোকে বড় লোক হয়! মরিরাম পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

মধ্যরাত্রে পাশের ঘরে একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনিয়া রজনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিল—দত্ত—দত্ত!

—ভুলুদত্ত!—মরিরাম—ওরে!

কেহ কোন সাড়া দিল না, সে আবার ডাকিল। অবশেষে তাহার খেয়াল হইল, দুইটা ঘরের মধ্যে একটা দরজা আছে এবং সেটা তাহার ঘর হইতেই খোলা যায়। সে তাড়াতাড়ি সেই দরজাটা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল,—মরিরাম তাহার বাপের বুকের উপর বসিয়া বাপের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বাপকে ছাড়িয়া দিয়া মরিরাম উঠিয়া দাঁড়াইল। রজনী বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর সুস্থ হইয়া দত্ত হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, দেখুন রজনীবাবু, কুলাঙ্গারের কাণ্ড দেখুন! আমাকে খুন করত আপনি না এলে।

মরিরাম ক্রোধস্ফীত মার্জ্জারের মত ফুলিতে ফুলিতে বলিল—না তোমাকে ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করব আমি। বুড়ো, আজ বাদে কাল মরতে যাবি, আবার বিয়ে করতে চলেছে।

দত্তর কান্না বন্ধ হইয়া গেল, সেও বিপুল ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—ওরে শূয়ার হারামজাদা, তাতে তোর কি? কেন করব না শুনি? তোদের মত অপোগণ্ডকে বিষয় দেবার জন্যে? লাখবার বিয়ে করব আমি। কে আটকায় আমাকে দেখি।

রজনী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—দেখ, এই রাত্রি একটার সময় যদি তোমরা এভাবে চীৎকার কর তবে পুলিশ আসবে। আর আমরা বাপু সারাদিন খেটেখুটে এসেছি—আমাদের একটু ঘুম দরকার।

দত্ত বলিল—ওই বলুন ওই শূয়ারটাকে।

তারপর আবার বলিল—যান আপনি রজনীবাবু, শুয়ে পড়ুন। আমি সারারাত্রি না হয় জেগেই কাটিয়ে দেব।

রজনী ঘরে গিয়া শুইল। বিপুল ক্রোধে পিতাপুত্রে পরস্পরের দিকে পিছন ফিরিয়া এ ঘরে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

পরদিন সকালে বিমল আসিবামাত্র দত্ত বিমলকে প্রকাশ্যভাবেই বলিল—আমি সংকল্প স্থির করে ফেলেছি মুখুজ্জে মশাই। আপনি সম্বন্ধ পাকা করে' ফেলুন আজই। বিয়ে আমি করবই।

বলিয়া সে মরিরামের দিকে অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বিমল বলিল—আমার সঙ্গেই মেয়ের বাপ এসেছেন, তুমি নিজেই ripe করে ফেল।

এক কথায় সম্বন্ধ পাকা হইয়া গেল, স্থির হইল—আগামীকল্য কন্যা দেখিয়া দত্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিবে। মরিরাম স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া সমস্ত দেখিল ও শুনিল।

ঠাকুরদাস হীরালাল, কোহিনূর জুয়েলারিজ, ডায়মণ্ড ট্রেডিং—প্রভৃতি

অনেক দোকানই ঘোরা হইল। সকলেই ঐ এক কথাই বলিল,—দামী পাথর বলেই মনে হয়, তবে না কাটলে সঠিক কিছু বলা যায় না।

অগত্যা শেষে বাঁশতলার গলিতে হ্যামিলটন কোম্পানীর প্রদত্ত ঠিকানায় দত্ত দল-বল সহ হাজির হইল। তাহারা দেখিয়া শুনিয়া বলিল—কাঁচা পাথর বাবুজী। কাটাতে চান কেটে আমরা দেব, কিন্তু মুনাফা কিছু হবে না।

দত্ত বিমলের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখুজ্জে মশায়।

মুখুজ্জে বলিল—কুচ্ পরোয়া নাই চলো বোম্বাই, দামও তোমার বোম্বাই মিলবে। এখানে সব son gramble-thief.

দত্ত আরও কয়টা দোকান ঘুরিল। সেখানেও সকলে ঐ এক কথাই বলিল। একজন বেশ পরীক্ষা করিয়াও পাকা পাথরের সহিত পার্থক্য দেখাইয়া দিল। দত্ত খুঁটে শক্ত করিয়া পাথরটাকে বাঁধিয়া বলিল—যাক্ রে বাবা, কাঁচা পাথর এক কালে ত' পাকবে। রেখে দেব আমি —বংশাবলীর কেউ না কেউ ভোগ করবে।

জহুরী হাসিয়া বলিল—ফল নয় যে পাকবে বাবুজী, ওর পাকা শেষ হয়ে গিয়েছে।

বাসায় ফিরিয়া দত্ত বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিল—কিছু খাইল না পর্য্যন্ত। সন্ধ্যা না হইতেই মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া পড়িল। বিমল মুখুজ্জে মেয়ের পাকা দেখার ব্যবস্থা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল। বলিয়া গেল—কাল সকালে আসব। তুমি রেডী হয়ে থাকবে।

সে-দিনও আবার মধ্যরাত্রে ও-ঘরের মধ্যে অস্বাভাবিক শব্দে রজনীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। মহা বিরক্ত হইয়া সে দরজা খুলিয়া ফেলিল। আজ ঘরে আলো জ্বালাই ছিল। রজনী দেখিল পিতার পদতলে বসিয়া পুত্র ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে, এবং পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পিতাও ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

রজনী বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল—কি, হ'ল কি তোমাদের ?

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে দত্ত বলিল—অথের কি মহিমা...। বাকীটা সে আর বলিতে পারিল না—ফু-ফু শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। রজনী মহা বিরক্ত হইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল—স্থির করিল—কালই এ আপদ বিদায় করিতে হইবে !

প্রাতঃকালে বিমলের হাঁক-ডাকে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। বিমল চীৎকার করিতে ছিল—Now here now gone,—এ যে বাবা King Bhoj's Magic দেখিয়ে দিলে ! বলি, সে ডেভিল দুটো গেল কোথায় ?

বেশ করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া দেখা গেল—দত্তেরা পিতা-পুত্রেই পলাতক, তাহাদের জিনিসপত্র কিছুই নাই। পড়িয়া আছে শুধু সেই পাথরটা।

ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান

গোটা কলকাতা শহরটা উত্তেজনায় একেবারে রণ রণ করছে। কি হয়, কি-হয় ব্যাপার। অন্তত চারভাগের তিনভাগ লোকের হার্টের প্যালপিটেশন বেড়ে গেছে, নাড়ির গতি দ্রুততর হয়েছে, থার্ম্মোমিটার দিলে টেম্পারেচার যে একশো ছাড়িয়ে উঠবে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কালীঘাটে মায়ের দরবারে মানসিক কত হয়েছে, তার হিসেব বলতে কেউ পারবে না, তবে সে মানসিক পেলে যে মায়ের মন্দিরের চূড়া এ-বাজারেও—অর্থাৎ আশি টাকা ভরিতেও সোনার হ'তে পারে—এতেও কোন সন্দেহ নাই। তবে মা জানেন এবং যারা মানসিক করেছে তারাও জানে—ওটা নিছক ঠাট্টা।

ব্যাপারটা গুরুতর। প্রায় জীবনমরণ সমস্যা বললেও চলে। অবশ্য বাঙালী জাতের জীবন-মরণ সমস্যা! জাপানী বোমা নয়, ভয়ের কারণ নেই। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের উদ্বেগ নয়; আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে জার্ম্মান সৈন্যের সঙ্ঘর্ষের কোন উৎকণ্ঠা নয়; মহাত্মা গান্ধীর উপবাস শেষ হয়ে গেছে, আপাতত তিনি ভাল আছেন—সে-জন্যেও নয়; চাল চল্লিশ টাকায় পৌঁচেছে—রাস্তায় ভিখারীরা মরছে অনাহারে—ব্যাপার তাও নয়; চেতাবনীও নয়—এ উত্তেজনায় চেতাবনী পর্য্যন্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা হ'ল—

লর্ড কার্জ্জন জিতবেন কি স্থরেন বাঁড়ুজ্জে জিতবেন। মর্ত্ত্যে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করে যে যুদ্ধ তাঁদের মধ্যে বেধেছিল—স্বর্গে আবার সেটা বেধে গেছে। তারই ঢেউ গোমুখী বেয়ে নেমে এসেছে বঙ্গভূমির কলকাতা

মহানগরীতে। ফলে বিবাদ বেধেছে ভাগীরথী এবং পদ্মায়। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলে। চামড়ার লাড্ডু নিয়ে দ্বন্দ্ব। লীগ-চ্যাম্পিয়ানশিপ কে পায়! ঘটী এবং বাঙ্গালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বন্দে মাতরমের প্রায়শ্চিত্ত উল্টো রাখীবন্ধন!

আজই তার একরকম মীমাংসা হয়ে যাবে। কাষ্টম্স্ ও ইষ্টবেঙ্গলে খেলা। এ খেলায় যদি ইষ্টবেঙ্গল হারে কোনমতে তবে কেল্লাফতে, জয় ভাগীরথীর; মোহনবাগানের লীগ-চ্যাম্পিয়ানশিপ আজই নির্দ্ধারিত হয়ে যাবে। ড্র গেলেও তাই। তবে ইষ্টবেঙ্গল জিতলে আর একদফা ভীষণতর উত্তেজনার দুর্ভোগ আছে।

মোহনবাগানের ভক্তদল মানসিক করেছে—হে মা কালী, আজই খতম করে দাও। তোমায় প্রণাম করে পূজো দিয়ে আজই প্রসাদী মাংস কিনে এনে মাংসের ঝোল আর ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে বাঁচব।

ইস্টবেঙ্গলের ভক্তদল মানসিক করেছে—জয় কলকাত্তাওয়ালী জিতিয়ে দাও মা, বোকামি করো না, আজ পূজো তো পাবেই, আবারও যে পাবে; 'আবার-খাবো' সন্দেশ দেবো। তোমার মন্দিরের ঘাট থেকে ডবল দাম দিয়ে ইলিশ কিনে আনব। জিভের ওপর থেকে দাঁতের পাটি দুটি অল্প আল্গা করে তুলে একটু—একটুখানি হাস মা!

বিখ্যাত হরিভক্ত রতন ঘোষাল দুর্গানাম জপ করছে। সকালে উঠে আরম্ভ করেছে, শেষ করবে খেলা ভাঙার হুইসিল বাজলে। ওঁ দুর্গা—ওঁ দুর্গা জপই চলেছে। প্রতি দশবারের শেষে বলছে—জয় কাস্টম্সের।

বিখ্যাত নৃত্যবিদ কমল কর সকালে উঠেই একটু নেচে নিয়ে ছোট ভাইটিকে ডাকলে, শোন!

—কি?

নাকের দুই ছিদ্রে দুটো আঙুল পুরে ভেবে নিলে বড়টা ধরলে কাস্টমস জিতবে, আর ছোটটা ধরলে ইস্টবেঙ্গল। আঙুল দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বললে—ধর একটা।

ছেলেটা একটু অতিমাত্রায় চতুর, সে দেখলে—বড়টা যখন দাদা এগিয়ে দিচ্ছে—তখন তার ছোটটাই ধরা উচিত—সেইটিকেই সে দাদার ইঙ্গিত বলে ধরে নিলে। সে খপ্ করে ধরলে ছোটটা। আরও একদিন ছোটটা ধরে সে দাদার কাছে একটা দো-আনি পেয়েছিল।

কমল ঠাস করে বসিয়ে দিলে তার গালে এক চড়। তার পরই চৌদুনে পা ফেলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। রেস খেলায় যে গণৎকার গণনা করে—তার বাড়ি চলে গেল।

ঢাকার নারান বোস সকালবেলাতেই চিৎপুর থেকে বাগবাজারে গঙ্গার ধারে টহল মেরে বেড়াচ্ছে; ওখানে এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী থাকে। সে নাকি পিশাচসিদ্ধ লোক। সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, গোলকে চ্যাপ্টা করে দিতে পারে—চ্যাপ্টা তার হুকুমে গোল হয়ে যায়। নির্ঘাৎ ফেলের ছেলে কত যে তাকে চার আনার গাঁজা দিয়ে পাশ করে গেছে—তার সংখ্যা নেই। মাত্র চার আনার গাঁজা। নারান বোস আট আনার গাঁজা পকেটে ক'রে ফিরছে। বেশি না, তিনখানি বাবা, কাষ্টমসের গোল—ঢুকিয়ে দিয়ো।

বউবাজারের একটা মেসে দুই বন্ধুতে ঘুষোঘুষি হয়ে গেল।

বাড়ির গিন্নীরা বিব্রত হয়ে উঠেছেন। সকাল থেকেই তাঁরা শাঁখ খুঁজে পাচ্ছেন না।

হারজিতের উপর বাজির টাকার পরিমাণ—পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। অসমসাহসী জুয়াড়িরা কাষ্টমস জিতবে বাজি রেখেছে—পাঁচ-পঁচিশ হারে কাষ্টমস হারলে পাঁচ টাকা দেবে, জিতলেনেবে পঁচিশ টাকা।

স্কুল-কলেজের ছেলেরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। মেয়েদের স্কুল-কলেজেও তাই। শতবর্ষের যুদ্ধের ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মত তারা ফুঁসছে। কিন্তু শিক্ষকসম্প্রদায় উভয়পক্ষের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেলের মত বর্তমান থাকায় যুদ্ধটা হাতেকলমে হ'তে পারছে না। তবুও বোর্ডে মধ্যে মধ্যে লেখার আবির্ভাব হচ্ছে, কে যে কখন লিখে দিচ্ছে, ধরতে পারা যায় না। হঠাৎ দেখা গেল—বোর্ডে চারটি বড় বড় শূন্য এঁকে কে লিখে দিয়েছে—গোয়ালন্দের তরমুজ খাইব্যা ?

কিছুক্ষণ পর দেখা যায় শূন্যগুলো আছে, কিন্তু লেখা লাইনটা মুছে সে জায়গায় লিখে দিয়েছে—রসাল রাজভোগ ? এবং শূন্যগুলো সংখ্যায় বেড়ে চারটে থেকে ছটায় দাঁড়িয়েছে।

বস্তিতে ঝিয়েদের মধ্যেও বচসা লেগে গেছে, একপক্ষ বলছে, উড়ে এসে জুড়ে বসে—বড় বাড় বেড়ে গেছে দেখি—আমার তিন ঘরের কাজ কেড়ে নিয়েছিলি—জিতবি, তোরা জিতবি ?

উত্তর এলো—উইড়া আসছি ? বেশ করছি। উইড়া আসতে পারি—আসচি। গায়ের জোর আছে বইলাই জুইড়া বসছি। গতর খাইটা মুনিবেরে খুশী করছি, মুনিব তোমাগো লাথি মাইরা খেদাইয়া দিছে, ঠিক করছে। জিতুম, জিতুম—খেলাতেও আমরা জিতুম—আলবৎ জিতুম।

বস্তির ছেলেগুলো তো এরই মধ্যে ঢেলা ছোঁড়াছুড়ি আরম্ভ করে দিয়েছে।

....র রাজবাড়িতে বড় বড় ডাক্তার আসছে। নিশ্চয় কুমার সুরেন্দ্রের ব্লাডপ্রেসারটা বেড়ে গেছে।

কমল প্রলয় নাচন তালে পা ফেলে বাড়ী ফিরল। যাবা মাত্র প্রণংকার ফিক্ ক'রে হেসে বলেছে—M. B. vs. E. B ?

—না—না। আজ E. B. vs. Customs.

—ওই হ'ল হে। চাঁদে গ্রহণ লাগে। লোকে ভাবে লড়াইটা বুঝি। —চাঁদে রাহুতে, কি চাঁদে কেতুতে! ওরে বাবা, আসলে যুদ্ধটা হ'ল বৃহস্পতি আর শুক্রে। দেবগুরু আর দৈত্যগুরু!

কমলের তাক লেগে গেল এ অভিনব ব্যাখ্যায়।

জ্যোতিষী বললে—মাভৈ!

—মাভৈ?

—একেবারে নির্ঘাৎ! শনি মকরে, ভারতে মহা-সুসময়। মোহনবাগানকে ঠেকায় কে? এবার দেখবে—এই যে গ্রহণটা আসছে—তাতে রাহু চাঁদের কচুও করতে পারবে না, চাঁদ রাহুকে গিলবে। মোহনবাগানের ভাগ্যে কাষ্টম্স জিতবে।

কমল কপালে হাত ঠেকিয়ে শনিকেও প্রণাম করলে—মকরকেও প্রণাম করলে। উৎসাহে ভয়ে লাফ দিয়ে সে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। মার দিয়া কেল্লা।

গণক ডাকলে—সবুর।

কমল বুঝতে পারলে—এখন সে সবুর করলে—জ্যোতিষীর ক্ষেতে মেওয়া ফলবে, সে ধাঁ ক'রে বেরিয়ে পড়ে বললে—ও-বেলায়, না, কাল কিম্বা পরশু! শনি মকরে, রাহু এবার চাঁদের কচুও করতে পারবে না। ভারতের সু-সময়! অন্যায় ফট্! উঁহু! লাথ্যায় ফট্! মাভৈ। এবার দৈত্যগুরু শুক্রের আর একটা চোখও কানা হয়ে যাবে। ধাঁই করে একখানি মোক্ষম স্যুট! ঢুকে গেল 'গোলির' হাতের আঙুলের ডগা ছুঁয়ে—একেবারে কোণ ঘেঁষে—সড়াকসে! লাথ্যায় ফট্।

বাড়ীর উঠোনে কোন ছোট ছেলের একটা বালিশ রৌদ্রে দেওয়া হয়েছিল; হাত ছয়েক দূরের সামনের ঘরের দরজা লক্ষ্য করে কমল

বালিশটাতে ঝেড়ে দিলে এক শ্যুট। মনে মনে ঠিক করে নিলে—যদি দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে যায়—তবে খাঁটি চাঁদে রাহু গিলবে, তবে কাস্টমস আজ চার-চারিটিখানি; যদি দরজার মুখে পড়ে তবে—দেবে দুখানা; আর যদি আশেপাশে যায় তাহলে? তা'হলেও একখানা। শনি মকরে—! লাথ্যায় ফট্। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উঠানটা তূলোয় তুলোময় হয়ে গেল। বালিশটা এক ইঞ্চি নড়ল না, কমলের জুতো বালিশটাকে ফাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। যাঃ—শালা! সত্যি সত্যিই লাথ্যায় ফট হ'য়ে গেছে।

বাইরে থেকে ঠিক এই সময়ে কে ডাকলে—কমল! কমল!

অসিত রায়। ভেটারেন সাপোর্টার অব এম-বি। মস্ত বড় ডাক্তারের ছেলে, নিজে যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা ফেঁদেছে। খেলার মাঠে এতখানি চীৎকার ক'রে হাত পা ছুড়ে কেউ উৎসাহ দিতে পারে না। মাঠেই কমলের সঙ্গে অসিতের আলাপ।

—Yes brother—yes—, কমল ছুটেই বেরিয়ে এল। পায়ে তার তখনও বালিশটা লেগে রয়েছে।

অসিত ভীষণ রকমে উত্তেজিত।

—What's the ব্যাপার brother?

—Great news,

—হতেই হবে! হুঁ-হুঁ। শনি মকরে। ভারতের সু-সময়। লাথ্যায় ফট্। একেবারে তুলো ধোনা হয়ে যাবে। কাষ্টমস জিতবেই। কিন্তু what is that great news—কারুর ঠ্যাং ট্যাং?

—না! না! আমি সে রকম হীনচেতা নই। কারুর ঠ্যাং ভাঙলে আনন্দ হবে কেন?

—তবে?

—বলছি। তার আগে শোন। আজ Ground-এর ধারে চেয়ারে

বসব। তুমি আমার আপিসে যাবে। সেখান থেকে দু'জনে সড়াক্সে বেরিয়ে পরব।

—Thats right—কিন্তু great newsটা কি?

সলজ্জভাবে পুলকিত হাসি হেসে অসিত বললে—বিয়ে!

—বিয়ে? my God—! বিয়ে? তোমার বিয়ে?

—Yes!

—কবে? কোথায়?

—বাবা ধরেছিলেন—এই মাসের মধ্যেই। আমি বলে দিয়েছি—no, that can't be.—Ican't. I have no time to spare.

—Why?

—এই anxiety মাথায় নিয়ে বিয়ে করা যায়? আমি বলে দিয়েছি—plain and simple; বিয়ে after the shield final—

—Thats right! Thats right. ঠিক বলেছ তুমি! বিবেকানন্দ বলেছিলেন—তোরা এখন বিয়ে করিস না! দেশের সেবা কর! Thats right, কিন্তু বিয়েটা হচ্ছে কোথায়?

—খাস দিল্লী। মেয়ের বাপ—বাবার old friend—দিল্লী সেক্রেটারিয়েটের কেষ্ট-বিষ্টু?

—good! ক্লাব সুদ্ধ গিয়ে দিল্লীকা লাডডু খেয়ে আসব!

—নিশ্চয়।

—বউ কেমন?

—মেয়ে আই-এ পড়ছে! কেমন তা জানি না। শিগ্গির দেখতে যাব। অসিত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। তারপর বললে—তাহ'লে তুমি আসছ আমার আপিসে। ঠিক তো?

কমল বললে—O. K.

রিমিঝিমি বৃষ্টি। তবু খেলার মাঠে হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে লোক। গ্যালারির বাইরে থেকে কোর্টের ধার পর্য্যন্ত জনসমুদ্র জমে গেছে। অনেকের হাতে খেলা দেখবার জন্য বিশেষভাবে আবিষ্কৃত আয়না। অনেকে গ্যালারির পিছনে দাঁড়িয়ে গ্যালারির উপরে দণ্ডায়মান দর্শকের কাছে শুনে খেলার রস উপভোগ করছে। খেলার মাঠ বৃষ্টিতে পিছল হয়ে গেছে। চামড়ার বলটা ধুপ-ধাপ করে ছুটছে—এদিক থেকে ওদিকে। তিরিশ চল্লিশ হাজার হৃদয় সঙ্গে সঙ্গে টিপ টিপ ক'রে স্পন্দিত হচ্ছে।

রতন ঘোষাল 'Club-গ্যালারির' উপর বসে এক হাতে গুনে দুর্গানাম জপছে, অন্য হাতটা ছুঁড়ছে, একেবারে মাথার উপর বসেছে সে। এরিয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামবাজারের রামদাদা। মধ্যবয়সী, দিব্য নাদুস্-নুদুস্ চেহারা। ও-অঞ্চলের সকলেরই দাদা। ঘোষালের মারফৎ শুনে খেলা দেখাচ্ছেন তিনি এবং হাত-পা ছুঁড়ছেন ঘোষালের দেখে দেখে—কিন্তু তাঁর আবেগ এবং আক্ষেপ তাতে একবিন্দু কম হয়নি।

হঠাৎ ঘোষাল চেঁচিয়ে উঠল—মা! মা! মা! ঠিক বলিদানের সময় শাক্তভক্তেরা যেমন মা-মা বলে চেঁচায়।

বাইরে রামদাদা—উদ্যত-কাঠি ঢাকির মত নাচবার এবং চেঁচাবার জন্য উদ্যত হয়ে রইলেন। ঘোষাল—'খাজ্জিং জিং' বলে চেঁচালেই তিনিও আরম্ভ করবেন—'জিনাক জিজিং লাগ জিং-জিং জিনা' সঙ্গে সঙ্গে মারবেন এক ডিগবাজি! সে কাদাই থাক্ আর কাঁটাই থাক!

গ্রাউণ্ডের ধার ঘেঁষে চেয়ারে বসেছে অসিত এবং কমল। রেসের ঘোড়ার জকির মত—কমল বেঁকে পড়ে—একটা হাত ক্রমাগত ছুঁড়ছে—ওরে-যা! ওরে-যা! ওরে-যা!

বলখানা গিয়ে পড়ল ই-বি'র ব্যাকের পায়ে। কাস্টমসের কেউ নেই। সে নিশ্চিন্তে ধাঁই করে পাঠিয়ে দিলে এদিকে।

কমল বললে—শা—পা। জা—নয়—নগদ। কথা কানেই তুললে না।

অসিত চেঁচাচ্ছিল—দে গোল,—গোল! দে গোল,—গোল! সেও থেমে গেল।

কুমার সুরেন্দ্রের নাড়ি ধ'রে বসে আছেন কুমারের ডাক্তার।

কুমার বললেন,—এক ডোজ্ খাই? অর্থাৎ, ফ্লাস্কের পানীয়।

রতন কেঁপে উঠে চোখ বুজল—মৃদু-কম্পনে ঠোঁটদুটি কাঁপতে লাগল—ত্রাহি দুর্গে, ত্রাহি দুর্গে!

রামদাদা বাইরে থেকে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন—রতন?

—গেল—দাদা—গেল। দিলে!

—কি? ই-বি?

রতন উত্তর দিতে পারলে না; ই-বি'র সমর্থকদের চীৎকারে আকাশ ফেটে যাচ্ছে—চালাও! চালাও! চালাও!

অসিত গুম হয়ে বসে গেছে। পাশের লোকটির উৎসাহিত হাতের আক্ষেপে কনুইয়ের গুঁতো এসে লাগল তার পাঁজরায়। সে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললে—হঠাও হাত! লোকটা কিন্তু গ্রাহ্যও করলে না। ক্রমাগত তার কনুইয়ের গুঁতো অসিতকে আঘাত করতে লাগল।

—চালাও! চালাও! চালাও!

হয়তো একটা ঝগড়া হ'ত। কিন্তু ওই কনুইয়ের গুঁতোর চেয়ে অধিকতর আঘাত সে অনুভব করছিল ই-বির মেম্বর গ্যালারীর সভ্যদের উৎসাহ দেখে। বিশেষ ক'রে কয়েকটি সভ্যার রণরঙ্গিনী-সুলভ চীৎকার তার বুকে এসে শেলের মত বাজছিল। সে কমলকে দুঃখের সঙ্গেই বললে—শা-লা আমাদের একেবারে ভিখারী রাঘব বানিয়ে ছেড়ে দিলে!

কমল উত্তর দিলে না। তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। বল কাস্টমসের গোলের মুখে।

রতন মিটিমিটি করে চোখ চেয়ে দেখেই কষে চোখ বুজলে। বললে—হ'ল ! হয়ে গেল ! দাদা !

ওদিকে ই-বির সমর্থকরা চীৎকার শুরু করে দিয়েছে—গোল ! গোল ! গোল !

রামদা বললেন—কক্ষনো না। গো-হত্যা ব্রহ্ম-হত্যা হবে ! চেয়ে দেখ—তুই চেয়ে দেখ রতন ! বারের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। দেখ !

রতন নিশ্বাস ছেড়ে বললে—মারভেলাস, মারভেলাস্ ! গোলিটা একদম—বাঘ বাচ্চারে বাবা !

রামদা হেসে বললেন—খা লিয়া গোলি ? অঁ্যা ?

—হঁ্যা রুখেছে। মারভেলাস্ রুখেছে !

আবার বল ছুটেছে ই-বির গোলের দিকে। ই-বির উৎসাহী সভ্যাদের রাগে চোখে জল আসছে, তারা সজল চোখে এম-বির মেম্বারদের বলছেন—আন্ সিভিলাইজ্ড্ ভালগার—ব্রুট্স্ কোথাকার !

রতন চেঁচিয়ে উঠল—ফ্যাল, ফ্যাল—ভেঙে ফ্যাল দুর্গদ্বার !

কমল চেঁচালে—মার—মার—মার। লাথ্যায় ফট্ এই শা-লা—লাথ্যায় ফট্।

অসিত চেঁচাচ্ছে—দে—গোল—গোল ! দে গোল ! গোল !

প্রচণ্ড আকাশ বিদীর্ণ-করা চীৎকার উঠল—গোল—গোল—গোল !

অসিত চীৎকার করে উঠল—হাইকোর্ট ! হাইকোর্ট ! হাইকোর্ট !

কলেজের ছেলেরা চেঁচালে—তরমুজ্জা ! তরমুজ্জা ! তরমুজ্জা !

কমলের সেই বুলি—লাথ্যায় ফট ! লাথ্যায় ফট ! লাথ্যায় ফট !

রতন নাচছে—রামদা বাইরে ডিগবাজী খাচ্ছে ! ই-বির মহিলা সভ্যারা রুমালে চোখ মুচছে। পুরুষেরা বসে আছে গুম হয়ে।

দেখতে দেখতে আরও একখানা গোল দিয়ে দিলে কাস্টম্‌স। এবার সে কলরবের আর তুলনা হয় না। ইতিহাসে নেই। ক্রমওয়েলের আমলে ইংলণ্ডের লোকে এত উচ্ছ্বসিত চীৎকার করেনি! ফরাসী বিপ্লবে—ফরাসী জনসাধারণ এত উল্লসিত হয়নি! স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন মুল্লুকের আকাশ মানুষের চীৎকারে এমন ক'রে কাঁপেনি! রুশ বিপ্লবে এমন উন্মাদনা আসেনি! সে কি কলরব! সে কি উন্মাদনা!

অসিত নাচতে লাগল। মুখে মুখে সে কবিতা বেঁধে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ তার পড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল সে দেখেছে! সে কবিতা আবৃত্তি করছে আর নাচছে! রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গলের নাচ হুবহু অনুকরণ ক'রে নাচছে।

"দে গোল, গোল! দে গোল—গোল! দে গোল—গোল!
দেখলায় দিয়া হাইকোর্ট আর হাওড়া পোল!
দে গোল—গোল!
আজকে টাকায় তিনটে ইলিশ—বানাও ঝোল!
দে গোল—গোল!"

বাইরে শাঁখ বাজছে—ঘণ্টা বাজছে। শনি মকরে, ভারতের সু-সময়! লাথ্যায় ফট্! কমল হাঁকছে লাথ্যায় ফট! আকাশে মেঘ ডাকছে—জয় গর্জন!

খেলা ভেঙে গেছে। ই-বি হেরেছে। ট্রামে লোক ধরে না। অসিত কমল লাফিয়ে এসে চড়ল ট্রামে। কণ্ডাক্টার হাঁকলে—টিকিট!

ওয়াটারপ্রুফ গায়ে—মাথায় ওয়াটার প্রুফ টুপি আঁটা এক ছোকরা চেঁচিয়ে বললে—আজ টিকিটের দাম ই-বি দেবে। বিল পাঠিয়ো। নো টিকিট টু-ডে! জয় কালী—কলকাত্তাওয়ালী—চালাও পানসী!

রাস্তার দুধারের লোককে বাঙাল ঠাউরে সে চীৎকার করে শুনিয়ে দিচ্ছে—কেমন? কেমন?

—কি?

—তিন—তিনখানি। তরমুজ্জা!

ভেতর থেকে কমল চেঁচিয়ে পাদপূরণ করছে—লাথ্যায় ফট্।

মেডিকেল কলেজের ধারে ট্রাম এসে থামল। ক'জন চেঁচিয়ে উঠল—ইস্টবেঙ্গল সোসাইটি! সামনে।

সেই ওয়াটারপ্রুফ মোড়া তরুণটি চীৎকার ক'রে উঠল—নাচব—আমি নাচব, নেমে—ফুটপাতের ওপর নাচব। সেই কবিতাটা কি রে বাবা?

ভেতর থেকে আত্মপ্রসাদস্ফীত অসিত আবৃত্তি করে উঠল—"দে—গোল—গোল। দেখলায় দিয়া হাইকোর্ট আর হাওড়া পোল।" গাড়ী সুদ্ধ আবৃত্তি চলতে লগাল।

কলুটোলার মোড়ে এসেই কিন্তু সমস্ত উৎসাহ জল হয়ে গেল। হতাশার ধ্বনি উঠল—বেস্পতিবার! বন্ধ! দোকান বন্ধ!

মুহূর্ত্তের জন্য সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে লেডিস সিট থেকে একটি মেয়ে মুখ ফিরিয়ে ঘৃণা ভরে বললে—কলকাতার লোকের মত অসভ্য লোক আমি দুনিয়ায় দেখিনি।

—What?

—E. B. E. B.—নির্ঘাৎ বাঙাল।

—এত চীৎকার করছেন কেন আপনারা?

—চীৎকার করব না? বাঙালীর গৌরব—

অত্যন্ত তীক্ষ্ণস্বরে মেয়েটি বললে—বাঙালীর গৌরব?

—yes, এগিয়ে এল অসিত। বাঙালীর গৌরব। খেলায় বাঙালীর

গৌরব এম-বি, সিনেমায় বাঙালীর গৌরব ছন্দরাণী, থিয়েটারে বাঙালীর গৌরব পটবাহু, সাহিত্যে বাঙালীর গৌরব রবীন্দ্রনাথ—

কথা কেড়ে নিয়ে মেয়েটি বললে—যাক, বৃদ্ধের আত্মাকে নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া করবেন না।

ওদিক থেকে একজন এতক্ষণে বলে উঠলেন—রবীন্দ্রনাথের বাপ-পিতামহ ইস্টবেঙ্গলের লোক মশায়।

কমল তীক্ষ্নস্বরে বললে—বলেন কি?

অসিত হেসে বললে—তা' হলে কাশীর ল্যাংড়া আমের বাড়িও সিলোন। অশোকবনে হনুমান আম খেয়ে আঁটি ছুড়ে ফেলেছিল সমুদ্রের এ পারে।

সমস্ত গাড়ী সুদ্ধ লোক হো—হো ক'রে উঠল। লোকটির মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠল। সে বললে—আমি মশায় হিষ্টোরিয়ান; কুলপঞ্জিকা ঘাঁইটা প্রমাণ কইরা দিমু। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বোস, পি সি রায়।

অসিত বলে উঠল—নাদির শা, চেঙ্গিজ খাঁ, আইনস্টাইন, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট।

গাড়ীতে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। ভদ্রলোক আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। সে সিট থেকে উঠে আস্তিন গুটিয়ে বললে—ঘুঁষি মাইরা তোমাগো নাক উড়াইয়া দিমু কইলাম। অসিতও আস্তিন গুটিয়ে বললে—কাম অন। এম বি ভার্সাস ই বি। কাম অন।

—করছেন কি আপনারা? বলে উঠল সে মেয়েটি।

অসিতের মাথায় তখন খুন চড়েছে, সে মেয়েটি পরিহাস করে বলে উঠল—ই বি, ই বি এণ্ড ই বি!

মেয়েটি যেন দপ ক'রে জ্বলে উঠল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল—অসিত তারই সিটের পিছনে হাত দিয়ে রয়েছে, তার হাতে চাপা পড়ে গেছে কাপড়ের আঁচলের খানিকটা। সে আঁচলখানা মুহূর্তে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ঠাস ক'রে কষিয়ে দিলে অসিতের গালে এক চড়।

গোটা গাড়ীখানা একেবারে হৈ হৈ করে উঠল। কমল সর্বাগ্রে চীৎকার করে উঠল—মার—মার অসিত ওর গালে দুই চড়।

—মারুন, মারুন—মশায়!

—কিসের খাতির!

অসিত কিন্তু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কতকটা। ও দিকে পিছন থেকে সেই ওয়াটারপ্রুফ মোড়া চণ্ডমুণ্ডের ওয়াবিশটি কনুয়ের গুঁতো দিয়ে লোক সরিয়ে এগিয়ে আসছিল বীর বিক্রমে। দেখ—লেঙ্গে। দেখ লেঙ্গে। চলুন—চলুন—দেখি আমি একবার, চলুন। গাড়ীর কোলাহল কিন্তু ভিতর দিকে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ছোকরা আস্তিন গুটিয়ে অসিতকে ঠেলে সামনে এসেই ভয়ে আঁতকে উঠল; অসিতের সামনে মেয়েটিকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সামরিক কর্মচারী; পূর্ণ সামরিক পোশাক, কাঁধে তিনটে স্টার; ইয়া কাঁচা পাকা এক জোড়া গোঁফ, হাতে একটি খেঁটে!

অফিসারটি কিন্তু বিশেষ কিছু বললেন না ছোকরাকে, কেবল তার উঁকিমারা মুখে নাকের উপর হাতের খেঁটে দিয়ে মৃদু একটি আঘাত দিয়ে বললেন—হটো!

ছোকরা সুট ক'রে মুখখানি টেনে নিলে।

অফিসারটি অসিতকে বললেন—আমার মেয়ে অন্যায় করেছে। আমি মাফ চাইছি।

অপ্রতিভ অসিত বললে—না— না—না— !

অফিসারটি মেয়ের হাত ধরে বললেন—নেমে এসো মীরা!

বেলগেছিয়ার পার্ক অঞ্চলে অসিতদের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ী। অসিত বাড়ির ফটক খুলে বাগানের রাস্তা অতিক্রম ক'রে গাড়ীবারান্দায় এসেই দেখলে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। বুঝলে কোন আগন্তুক এসেছে।

—প্রথমেই তার বাবার চেম্বার। সেখানে আলো জ্বলছে। বুঝলে সেখানে কোন রোগী এসেছে। চেম্বারের দরজার কাছে এসেই তার কানে গেল একটা কণ্ঠস্বর।

—আর মশায়, বলেন ক্যান। কমাস ধইরা জীবনটারে খাক কইরা দিছে। তুপুর রাতে চীৎকার কইরা উঠে; বাড়ীসুদ্ধ—ধড়ফড়াইয়া জাইগা উঠে—হইল কি? শুনি, স্বপন ছাখছে—ইস্টব্যাঙ্গল গোল দিছে!

অসিত কৌতূহলী হয়ে ঢুকল। দেখলে একটি তরুণী মেয়ের ঠোঁট কেটে গেছে—নাকটা ফুলে উঠেছে—দরদর ধারে রক্ত পড়ছে। তার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন—কম্পাউণ্ডার সেলাইয়ের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে তুলছে। মেয়েটির ঠোঁটটা সেলাই করতে হয়েছে।

যিনি কথা বলছিলেন—তিনি এক বৃদ্ধ—মনের আবেগে তিনি বলেই যাচ্ছেন।—হতভাগা বাড়ী ফিরল—মুখ দেইখা ভয় লাগে। যেন সাত-পুরুষ নরকস্থ হইছে হতভাগার। কইল—থামু না কিছু, মাথা ধরছে।

বলতে বলতে আবেগ তাঁর বেড়ে গেল, বললেন—আর বউটাও হইছে তেমনি ধিঙ্গী। কইলকাতার বেটী, কথা কয় যেন—শরৎ চাটুজ্যা বই লিখছে। বউটা কইল—গোল হইয়া মাথা ধরছে বুঝি? কয়পাক দিয়া ধরছে গো?

ছেলেটা একেরে ক্ষেইপা গ্যালো। কইল—শুইনা লও। বইলাই মশয়—বসাইয়া দিল—দমাদম ঘুষি। এখন লও ফ্যাসাদ—।

অসিত আর হাসি চাপতে পারলে না। সে মুখে হাত দিয়ে বেরিয়ে

এল। তার বাপ ডেকে বললেন—ভেতরে চল—আমি আসছি। নিখিলবাবু এসেছেন।

ড্রয়িং রুমে ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল। সেই অফিসার এবং তাঁর মেয়ে! বেশ আসর জমিয়ে বসেছেন; অফিসারটি একদিকে—অন্যদিকে সেই মেয়েটিকে পাশে নিয়ে বসেছেন তার মা। দরজার মুখেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পিছন পিছন এসে ঘরে ঢুকলেন তার বাপ।

অসিতের বাপ বললেন—এই যে! এই আমার ছেলে অসিত! অসিত প্রণাম কর!

আমার বাল্যবন্ধু, নিখিলনাথ ব্যানার্জী দিল্লী সেক্রেটেরিয়েটের অফিসার, এখন সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে একটা ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ। এটি তাঁর মেয়ে মীরা!

নিখিলবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

অসিত প্রণাম করলে। তিনি শুষ্কভাবেই বললেন, থাক—থাক!

অসিতের বাপ বললেন—তুমি এলে ভাই—এখন হঠাৎ—কোন খবর নেই—কাল তুমি আর মীরা রাত্রে এখানে খাবে! কালই কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে যাবে।

নিখিলবাবু বিচিত্র হাসি হেসে বললেন—হঠাৎ আসতে হ'ল। বেঙ্গলে দুঃখ দুর্দশা লোকে না খেয়ে মরছে—খাদ্যশস্য নেই; এই সবের ব্যাপারে অন্য প্রভিন্স থেকে সাপ্লাইয়ের আলোচনায় জরুরী তাগিদে হঠাৎ আসতে হ'ল। মীরাকেও সঙ্গে নিয়ে এলাম। পৌঁচেছি আজ দশটায়। খবর নিতে পারিনি।

মীরা মৃদুস্বরে বললে—বাবা আমার মাথা ধরেছে। শরীরটা বড় খারাপ করছে।

নিখিলবাবু উঠলেন—বললেন—তা হলে উঠলাম ভাই আজ!

সঙ্গে সঙ্গে উঠে অসিতের বাপ বললেন—কাল রাত্রে তা' হলে—এইখানে খাবে।

জোড়হাত ক'রে নিখিলবাবু বললেন—বাঙ্গলাদেশে যা দেখলাম, তাতে আহার মুখে রুচছে না ভাই। আমি কাল দশটাতেই রওনা হব। তা ছাড়া আমরা চাকর। বুঝছ তো আমাদের বিপদ?

অসিতের বাপও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বাঙ্গলাদেশের ভবিষ্যৎ ভেবে কূলকিনারা পাইনা ভাই! ওই শোন না!

বাইরে অন্ধকারে শব্দ উঠছে—দুটো ভাত!

—চারটি ফ্যান ভাত!

—দুটো এঁটো কাঁটা!

অসিতের বাপ বললেন—তা' হলে চিঠিতেই কথাবার্ত্তা হবে।

নিখিলবাবু বললেন—আমায় মাফ করো ভাই, একটা কথা তোমায় বলব বলব করেও বলতে পারিনি; মীরা বিয়ে করতে চায় না। শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখলাম—মীরার কথাই ঠিক। মেয়ের বিয়ে আমি দেব না।

অবাক্ হয়ে গেলেন অসিতের বাপ—অসিতের মা।

অসিতের বুকটাও ধড়াস করে উঠল। হায়! হায়! সে খাঁটি বাঙালীর ছেলে—বাঙালী। প্রিয়া—প্রিয়ার গণ্ডের তিলের জন্য হাফিজ কবি বোখারা সমরন্দ বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—সে দুনিয়া বিলিয়ে দিতে পারে—লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, রোম—সব—সব! ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে পায়ে ধরে। কিন্তু তেজস্বিনীর সেই মূর্তি স্মরণ করে তার সাহস হ'ল না।

নিখিলবাবু মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। লর্ড কার্জন হাসছে।

ঝিমি—ঝিমি বৃষ্টি পড়ছে। সুরেন বাড়ুজ্জে কাঁদছে।

শেষ